হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম

হুমায়ূন আহমেদ



আজকের দিনটা এত সুন্দর কেন?

সকাল বেলা জানালা খুলে আমি হতভম্ব। এ কি! আকাশ এত নীল? আকাশের তো এত নীল হবার কথা না। ভূমধ্যসাগরীয় আকাশ হলেও একটা কথা ছিল। এ হচ্ছে খাঁটি বঙ্গদেশীয় আকাশ, বেশিরভাগ সময় ঘোলা থাকার কথা। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জানালার ওপাশে একটা কাক এসে বসল। কি আশ্চর্য! কাকটাকেও তো সুন্দর লাগছে। কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটছে। কলেজে ভর্তি হবার পরদিন যে ভঙ্গিতে কিশোরী মেয়েরা হাঁটে অবিকল সেই — "বড় হয়ে গেছি" ভঙ্গি। আমি মুগ্ধ হয়ে কাকটাকে দেখলাম। কাকের চোখ এত কাল হয়? কবি–সাহিত্যিকরা কি এই কারণেই বলেন কাকচক্ষু জল? আচ্ছা, আজ সব সুন্দর সুন্দর জিনিস চোখে পড়ছে কেন? আজকের তারিখটা কত? দিন–তারিখের হিসাব রাখি না, কাজেই তারিখ কত বলতে পারছি না। একটা খবরের কাগজ কিনে তারিখটা দেখতে হবে। মনে হচ্ছে আজ একটা বিশেষ দিন। আজকের দিনটার কিছু একটা হয়েছে। এই দিনে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে। পৃথিবী তার রূপের দরজা আজকের দিনটার জন্যে খুলে দেবে। কাজেই আজ সকাল থেকে জীবনানন্দ দাশ মার্কা হাঁটা দিতে হবে — "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" মার্কা হাঁটা। আমি ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামলাম। নষ্ট করার মত সময় নেই। কাকটা বিস্মিত গলায় ডাকল — কা কা। আমার ব্যস্ততা মনে হয় তার ভাল লাগছে না। পাখিরা নিজেরা খুব ব্যস্ত থাকে কিন্তু অন্যদের ব্যস্ততা পছন্দ করে না।

মাথার উপর ঝাঁঝালো রোদ, লু হাওয়ার মত গরম হাওয়া বইছে। গায়ের হলুদ পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে একাকার। পাঞ্জাবি থেকে ঘামের বিকট গন্ধে নিজেরই নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে, তারপরেও আজকের দিনটার সৌন্দর্যে আমি অভিভূত। হঠাৎ কোন বড় সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে স্নায়ু অবশ হয়ে আসে। সকাল থেকেই আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আছে। এখন তা আরো বাড়ল, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। সৌন্দর্যের কথাটা চিৎকার করে সবাইকে জানাতে ইচ্ছা করছে। মাইক ভাড়া করে রিকশা নিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে পারলে চমৎকার হত।

হে ঢাকা নগরবাসী। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ ৯ই চৈত্র, ১৪০২ সাল। দয়া করে লক্ষ্য করুন। আজ অপূর্ব একটি দিন। হে ঢাকা নগরবাসী। হ্যালো হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর। আজ ৯ই চৈত্র ১৪০২ সাল . . .

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি রাস্তার ঠিক মাঝখানে। বিজয় সরণীর বিশাল রাস্তা — মাঝখানে দাঁড়ালে কোন অসুবিধা হয় না। রিকশা গাড়ি সব পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। তারপরেও লক্ষ্য করলাম কিছু কিছু গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, বিড়বিড় করছে — নির্ঘাৎ গালাগালি। গাড়ির মানুষেরা মনে করে পাকা রাস্তা বানানো হয়েছে শুধুই তাদের জন্যে। পথচারীরা হাঁটবে ঘাসের উপর দিয়ে, পাকা রাস্তায় পা ফেলবে না।

রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার বেশ চমৎকার লাগছে। নিজেকে ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে পাজেরো টাইপ দামী কোন গাড়ি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলি — দেখি লাইসেন্সটা! ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র আছে? ফিটনেস সার্টিফিকেট? এক্সহস্ট দিয়ে ভক ভক করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নামুন গাড়ি থেকে।

আজকের দিনটা এমন যে মনের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হল। একটা পাজেরো গাড়ি আমার গা ঘেঁষে হুড়মুড় করে থামল। লম্বাটে চেহারার এক ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, হ্যালো ব্রাদার, সামনে কি কোন গণ্ডগোল হচ্ছে?

আমি বললাম, কি গণ্ডগোল?

'গাড়ি ভাঙাভাঙি হচ্ছে না-কি?'

'জ্বি না।'

পাজেরো হুস করে বের হয়ে গেল। পাজেরো হচ্ছে রাজপথের রাজা। এরা বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। কেমন গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করে। দেখতে ভাল লাগে। মনে হয় "আহা, এরা কি সুখেই না আছে!" পরজন্মে মানুষের যদি গাড়ি হয়ে জন্মানোর সুযোগ থাকতো — আমি পাজেরো হয়ে জন্মাতাম।

পাজেরোর ভদ্রলোক গাড়ি ভাঙাভাঙি হচ্ছে কি-না কেন জানতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি না। আজ হরতাল, অসহযোগ এইসব কিছু নেই। দু'দিনের ছাড় পাওয়া গেছে। তৃতীয় দিন থেকে আবার শুরু হবে। আজ আনন্দময় একটা দিন। হরতালের বিপরীত শব্দ কি? 'আনন্দতাল?' সরকার এবং বিরোধী দল সবাই মিলে একটা বিশেষ দিনকে আনন্দতাল ঘোষণা দিলে চমৎকার হত। সকাল-সন্ধ্যা আনন্দতাল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব খুলে যাবে — সবাই সবার গাড়ি নিয়ে হর্ন বাজাতে বাজাতে রাস্তায় নামবে। রাস্তার মোড়ে পুলিশ এবং বিডিআর থাকবে না। থাকবে তাদের ব্যান্ডপার্টি। এরা সারাক্ষণ ব্যান্ড বাজাবে। তাদের দিকে

পেট্রোল বোমার বদলে গোলাপের তোড়া ছুঁড়ে দেয়া হবে . . .

'হিমু ভাই না?'

আমি চমকে তাকালাম। গাঢ় মেরুন রঙের একটা গাড়ি আমার পাশে থেমেছে। গাড়ির চালকের সীটে যে বসে আছে তাকে দেখাচ্ছে পদ্মিনী গোত্রের কোন তরুণীর মত। কুইন অব সেবা, হার রয়েল হাইনেস বিলকিস হয়তো আঠারো-উনিশ বছর বয়সে এই মেয়ের মতই ছিল। কিং সোলায়মান বিলকিসকে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। আমারও অভিভূত হওয়া উচিত। অভিভূত হতে পারছি না — কারণ মেয়েটিকে চিনতে পারছি না। চেনা চেনাও মনে হচ্ছে না। এ কে?

'হিমু ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'এখনো পারছি না, তবে চিনে ফেলব।'

'আমি মারিয়া!'

'ও আচ্ছা, মারিয়া। কেমন আছেন?'

'আপনি চিনতে পারেননি। চিনতে পারলে আপনি করে বলতেন না।'

'ও চিনেছি — তুই? এত বড় হয়েছিস! আশ্চর্য! যাকে বলে পারফেক্ট লেডি। ঠোঁটে লিপস্টিক-ফিপস্টিক দিয়ে তো দেখি বেড়াছেড়া করে ফেলেছিস।'

'আপনি এখনো চেনেননি। চিনলে তুই তুই করে বলতেন না। তুই বলার মত ঘনিষ্ঠতা আপনার সঙ্গে আমার ছিল না।'

'ছিল না বলেই যে ভবিষ্যতেও হবে না তা তো না। ভবিষ্যতে হবে ভেবে তুই বললাম।'

'আপনি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'

'কিছু করছি না।'

'অবশ্যই কিছু করছেন। দূর থেকে মনে হল হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। পাগল-টাগল হয়ে যাননি তো? শুনেছি পাগলরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়, ট্রাফিক কন্ট্রোল করে।'

'এখনো পাগল হইনি। তবে মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই হব। তুই নিজেও গাড়ি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছিস। লোকে তোকেও মহিলাপাগল ভাবছে।'

'তুই তুই করবেন না। কেউ তুই তুই করলে আমার ভাল লাগে না। আপনি কি আসলেই আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'না।'

'কেউ আমাকে চিনতে না পারলেও আমার ভাল লাগে না। যাই হোক, সামনে কি গণ্ডগোল হচ্ছে? গাড়ি-টাড়ি ভাঙা হচ্ছে?'

'না। পাজেরোর মালিকরা অতি সাবধানী হয়। গণ্ডগোলের ত্রিসীমানায় তারা থাকে না। পাজেরো যখন গিয়েছে তখন তোমার গাড়িও যেতে পারবে।'

'গাড়ি সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই বলে আপনি এ রকম কথা বলতে

পারলেন। আমার গাড়িটা পাজেরোর চেয়ে অনেক দামী। এটা একটা রেসিং কার।'

'চড়তে কি খুব আরাম?'

'চড়তে চান?'

'হুঁ চাই।'

'তাহলে উঠে আসুন।'

আমি গাড়ির পেছনের দিকে উঠতে যাচ্ছিলাম — অবাক হয়ে দেখলাম, এই গাড়ির দু'টা মাত্র সীট। হাত-পা এলিয়ে পিছনের সীটে বসার কোন উপায় নেই। বসতে হবে ড্রাইভারের পাশে। মারিয়া বলল, সীটবেল্ট বাঁধুন।

আমি বললাম, সীটবেল্ট বাঁধতে পারব না। দড়ি দিয়ে বাঁধা-ছাদা হয়ে গাড়িতে বসতে ইচ্ছা করে না। গাড়িতে যাব আরাম করে। আমি কি গরু-ছাগল যে আমাকে বেঁধে রাখতে হবে?

'কথা বাড়াবেন না হিমু ভাই, সীটবেল্ট বাঁধুন। আমি খুব দ্রুত গাড়ি চালাই। অ্যাক্সিডেন্ট হলে সর্বনাশ।'

'এই রকম গিজগিজ ভিড়ে তুমি দ্রুত গাড়ি চালাবে কি করে?'

'শহরের ভেতরে ভিড় — বাইরে তো ভিড় না। আমি ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়েতে চলে যাব। দু'শ কিলোমিটার স্পীড দিয়ে গাড়িটা কেমন পরীক্ষা করব। কেনার পর থেকে আমি গাড়ির স্পীড পরীক্ষা করতে পারিনি।'

আমি শুকনো গলায় বললাম, ও আচ্ছা।

মারিয়া গাড়ি চালানোয় খুব ওস্তাদ আমার এ রকম মনে হচ্ছে না। হুটহাট করে ব্রেক কষছে। সাজগোজের দিকে যে মেয়ের এত নজর অন্যদিকে তার নজর কম থাকার কথা। পরনে লালপাড় হালকা রঙের শাড়ি। (শাড়ি পরে গাড়ি চালাচ্ছে কি করে? এক্সিলেটরে চাপ না পড়ে শাড়িতে পা বেঁধে যাবার কথা।) গলায় লাল রঙের পাথরের লকেট। সবচে বড় পাথরটা পায়রার ডিমের সাইজ। কি পাথর এটা?

পাথরের নাম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মারিয়া এমনভাবে ব্রেক কষল যে উইন্ড শিল্ডে আমার মাথা লেগে গেল। মারিয়া বলল, সীটবেল্ট থাকায় বেঁচে গেলেন। সীটবেল্ট বাঁধা না থাকলে মাথার ঘিলু বেরিয়ে যেত।

'মারিয়া!'

'জ্বি।'

'তুমি কত স্পীডে গাড়ি চালাবে বললে?'

'দু'শ কিলোমিটার — একশ পঁচিশ মাইল পার আওয়ার।'

'আমার এখন মনে পড়ল — আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। খুব জরুরী একটা কাজ আছে জিপিওতে। আসগর নামে এক লোক আছে — জিপিওর সামনে বসে থাকে, লোকজনদের চিঠি লিখে দেয়। সে খবর পাঠিয়েছে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। আমার খুব বন্ধুমানুষ।'

'আমি দু'শ কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চালাব এটা শুনেই আপনি আসলে আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছেন।'

'খানিকটা তাই। ভয় পাওয়াটা তো দোষের না — তোমার মত একজন আনাড়ি ড্রাইভার যদি দু'শ কিলোমিটার স্পীড দেয়, তাহলে আমার ধারণা গাড়ি রাস্তা ছেড়ে আকাশে উঠে যাবে।'

মারিয়া বলল, সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা না।

'আমাকে নামিয়ে দাও। আসগর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা না করলেই না।'

'আপনাকে আমি নামিয়ে দিতাম। কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেননি এই অপরাধের শাস্তি হিসেবেই আমি নামাব না।'

'যদি চিনে ফেলতে পারি তাহলে নামিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, নামিয়ে দেব।'

'তোমার মা'র নাম কি?'

'মা'র নাম, বাবার নাম কারোর নামই বলব না। মা-বাবাকে দিয়ে আমাকে চিনলে হবে না। আপনি আমাকে দিয়ে ওদের চিনবেন।'

'তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কবে হয়েছিল?'

'পাঁচ বছর আগে।'

'এখন তোমার বয়স কত?'

'কুড়ি।'

'পাঁচ বছর আগে বয়স ছিল পনেরো।'

'অংকশাস্ত্র তাই বলে।'

'এই জন্যেই চিনতে পারছি না। পনেরো বছরের কিশোরী পাঁচ বছরে অনেকখানি বদলে যায়। শুয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হবার ব্যাপারটা এর মধ্যেই ঘটে।'

'ফর ইওর ইনফরমেশন, আমি কখনোই শুয়োপোকা ছিলাম না। জন্ম থেকেই আমি প্রজাপতি।'

'তোমাদের বাসাটা কোথায়?'

'তাও বলব না।'

'তোমাদের বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম?'

'একসময় যেতেন। গত পাঁচ বছরে যাননি।'

'কেন যেতাম?'

'আমার এক সময় ধারণা ছিল আমাকে দেখার জন্যে যেতেন। এখন সেই ভুল ভেঙেছে।'

'ও, তুমি আসাদুল্লাহ সাহেবের মেয়ে — মরিয়ম।'

'মরিয়ম না, মারিয়া। আপনি মরিয়ম ডাকতেন, রাগে গা জ্বলে যেত। এখনও

দিকে তাকালাম। উনি বাজার করে ফিরছেন। বাজারের ব্যাগের ভেতর থেকে লাউয়ের মাথা বের হয়ে আছে। চৈত্র মাসে লাউ খেতে কেমন কে জানে।

'হ্যালো ব্রাদার!'

'আমাকে বলছেন?'

'জ্বি। একটা গুজব শুনলাম, শহরে আর্মি নেমেছে — সত্যি না-কি?'

'জানি না।'

'খুবই অথেন্টিক গুজব। আর্মি নেমেছে — হেভী পিটুন শুরু করেছে।'

'যাকে পাচ্ছে তাকেই পিটাচ্ছে?'

'প্রায় সে রকমই।'

লাউ-হাতে ভদ্রলোককে খুবই আনন্দিত মনে হল। আর্মি যাকে পাচ্ছে তাকে পিটাচ্ছে এতে এত আনন্দিত হবার কি আছে কে জানে। ভদ্রলোক তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গর্ত থেকে সাপ টেনে বের করলে সাপ কি ছেড়ে দেবে?

আমি বললাম, আর্মিকে সাপ বলছেন আর্মি জানতে পারলে আপনার লাউ নিয়ে যাবে। এবং আপনাকেও হেভী পিটুন দেবে।

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমি বুঝতে পারছি ভদ্রলোক এখন মনে মনে নিজেকেই গালি দিচ্ছেন — "কেন গায়ে পড়ে আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম?"

হাতে ঘড়ি নেই — অনুমান তিনটা থেকে সাড়ে তিনটায় জিপিওতে ঢুকলাম। মূল গেট তালাবন্ধ। দেয়াল টপকে ঢুকতে হল। বাইরে সিরিয়াস গণ্ডগোল। চলন্ত বাসে আগুন-বোমা ছোঁড়া হয়েছে। বাসের ভেতরটা ঝলসে গেছে। পুলিশ, বিডিআর চলে এসেছে। টিয়ার গ্যাস মারা হচ্ছে। রাস্তায় কিছু কাপড়ের দোকান ছিল। সেগুলি লুট হচ্ছে। ভদ্র-টাইপের লোকজনদের দেখা যাচ্ছে চার-পাঁচটা শার্ট বগলে নিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত চলে যাচ্ছে। বাসায় ফিরে স্ত্রীকে হয়ত বলবে — 'খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। আন্দোলনে একটা লাভ হয়েছে — চাল-ডালের দাম বাড়লেও গার্মেন্টসের কাপড়-চোপড় জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। চারটা শার্ট দাম পড়েছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ভাবা যায়?'

চূড়ান্ত রকম গণ্ডগোলের ভেতরও আসগর সাহেবকে পাওয়া গেল নির্বিকার অবস্থায়। তিনি টুল-বাক্স নিয়ে বসে আছেন। টুল-বাক্সের গায়ে লেখা —

আলী আসগর
পত্রলেখক।
পোস্ট কার্ড ১ টাকা
খাম ২ টাকা
রেজিস্ট্রি ৫ টাকা
পার্সেল ২৫ টাকা (দেশী)
পার্সেল ৫০ টাকা (বিদেশী)।

আসগর সাহেবের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসমর্থ। দেখে মনে হয় কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে জীবনযাপন করেন। চিঠি লেখা তেমন কোন শ্রমের কাজ না, তারপরেও ভদ্রলোকের চেহারায় পরিশ্রমের এমন প্রবল চাপের কারণ কি — কে বলবে। আসগর সাহেব একজনকে চিঠি লিখে দিচ্ছেন। আমি আসগর সাহেবের পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি একবার তাকালেন — আবার চিঠি লেখা শুরু করলেন। ভদ্রলোকের হাতের লেখা মুক্তার মত। দেখতেও ভাল লাগে। আমার চিঠি লেখার কেউ থাকলে ওনাকে দিয়ে লেখাতাম। কে জানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে পরিচয় হলে মারিয়ার চিঠির জবাব হয়ত দিতাম। তাঁকে দিয়েই লেখাতাম — প্রিয় মারিয়া, তোমার সাংকেতিক ভাষায় লেখা চিঠির মর্ম উদ্ধার করার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। . . . কি সর্বনাশ! মারিয়ার কথা ভাবা শুরু করেছি। সুইচ অফ করা ছিল — কখন আবার অন হল? ব্রেইন কি অটো সিস্টেমে চলে গেছে? আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলালাম। যে চিঠি লেখাচ্ছে তার দিকে তাকালাম।

যে চিঠি লেখাচ্ছে তাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। খালি পা। লুঙ্গি পরা। গায়ে নীল রঙের একটা গেঞ্জি। বেচারার হয়ত জ্বর এসেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে। যে ভাবে সে গড় গড় করে চিঠির বিষয়বস্তু বলে যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় সে দীর্ঘদিন ধরে অন্যকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে।

> প্রিয় ফাতেমা,
>
> দোয়াগো। পর সমাচার এই যে, আমি আল্লাহপাকের অসীম রহমতে মঙ্গলমত আছি। তোমাদের জন্যে সর্বদা বিশেষ চিন্তাযুক্ত থাকি . . .

আসগর সাহেব চিঠি লেখা বন্ধ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাইসাব, রাতে আমার সাথে চারটা খানা খান।

আমি বললাম, আজ না খেলে হয় না?

'কাজকর্ম থাকলে রাত করে আসেন। কোন অসুবিধা নাই। আজ বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের বাজার করব, আপনাকে নিয়ে চারটা ভাল-মন্দ খাব। অনেক দিন ভাল-মন্দ খাই না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন কি একটু চা খাবেন?'

'খেতে পারি এক কাপ চা।'

আসগর সাহেব হাত উঁচিয়ে চা-ওয়ালাকে চা দিতে ইশারা করে আবার চিঠি লেখায় মন দিলেন। আমি চা খেয়ে জিপিওর বাইরে এসেই পুলিশের হাতে ধরা খেলাম।

পুলিশের হাতে ধরা খাওয়ার ব্যাপারে সব সময় খানিকটা নাটকীয়তা থাকে — এখানে তেমন নাটকীয়তা ছিল না। রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে বাসপোড়া দেখছি। বাসের সব ক'টা জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে — পট পট পট পট শব্দ হচ্ছে। কেউ আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে না, বা বাসের চারদিকে ছোটাছুটিও করছে না। আমি অপেক্ষা করছি কখন ধোঁয়া বের হওয়া শেষ হয়ে সত্যিকার আগুন জ্বলবে। মোটামুটি রকমের আগুন জ্বললে সেই আগুনে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে রওনা হওয়া যেতে পারে। বাসপোড়া আগুনে সিগারেট ধরানো একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হবার কথা। আমি সিগারেট হাতে অপেক্ষা করছি।

এমন সময় শার্ট-প্যান্ট পরা এক লোক এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। ভদ্র চেহারা, কথাবার্তাও ভদ্র। আমাকে বললেন, আপনার ব্যাগে কি?

আমার কাঁধে চটের ব্যাগ। সেই ব্যাগে কয়েকটা টাকা এবং কিছু খুচরা পয়সা। আমার পাঞ্জাবির কোন পকেট নেই। জরুরী জিনিসপত্রের জন্যে পুরানো আমলের কবিদের মত কাঁধে ব্যাগ ঝুলাতে হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, ব্যাগ খালি।

ভদ্রলোক এবার গলার স্বর কঠিন করে বললেন, খালি কেন? মাল ডেলিভারি দিয়ে ফেলেছেন?

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কোন মালের কথা বলছেন?'

'ব্যাগে জর্দার কৌটা ছিল না?'

'জ্বি না, আমি তো পান খাই না।'

ভদ্রলোক বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আপনার পান খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বলেই খপ করে আমার হাত ধরলেন। এর নাম বজ্র আঁটুনি। হাতের দু'টা হাড় — রেডিও এবং আলনা মট মট করতে লাগল। যে কোন সময় ভেঙে যাবার কথা। এই ভদ্রলোক হাত ধরার ট্রেনিং কোথায় নিয়েছেন? সারদা পুলিশ একাডেমীতে?

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। নতুন পরিস্থিতির কারণে দিনের সৌন্দর্য কি কমে গেছে? দেখলাম, কমেনি। চারদিক এখনো অপূর্ব লাগছে। দিনের শেষের রোদে নগরী ঝলমল করছে। রোদের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। তেজী চনমনে গন্ধ। আমি অনেকদিন পর রোদের গন্ধ পেলাম। যে পুলিশ অফিসার আমার হাত ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন তাঁকেও ক্ষমা করে দিলাম। এমন সুন্দর দিনে কারো উপর রাগ রাখতে নেই।



'আপনার নাম কি?'

আমি ইতস্তত করছি, নাম বলব কি বলব না ভাবছি। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে আমরা সাধারণত খুব আগ্রহের সঙ্গে নাম বলি। জিজ্ঞেস না করলেও বলি। হয়ত বাসে করে যাচ্ছি — পাশে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। দু'-একটা টুকটাক কথার পরই হাসিমুখে বলি, ভাই সাহেব, আমার নাম হচ্ছে এই . . . আপনার নামটা?

মানুষ তার এক জীবনে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি শোনে তা হচ্ছে তার নিজের নাম। যতবারই শোনে ততবারই তার ভাল লাগে। পৃথিবীর মধুরতম শব্দ হচ্ছে নিজের নাম। পৃথিবীর দ্বিতীয় মধুরতম শব্দ খুব সম্ভব "ভালবাসি"।

'কি ব্যাপার, নাম বলছেন না কেন? প্রশ্ন কানে যাচ্ছে না?'

'স্যার যাচ্ছে।'

'তাহলে জবাব দিচ্ছেন না কেন?'

আমি খুক খুক করে কাশলাম। অস্পষ্ট ধরনের কাশি। নার্ভাসনেস কাটানোর জন্যে এ জাতীয় কাশি পৃথিবীর আদিমানব বাবা আদমও আড়চোখে বিবি হাওয়ার দিকে তাকিয়ে কেশেছিলেন। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা — এই সাড়ে সাত ঘণ্টা আমি রমনা থানার এক বেঞ্চে বসে ছিলাম। আমি একা না, আমার সঙ্গে আরো লোকজন ছিল। তারাও আমার মত ধরা খেয়েছে। এক এক করে তারা ওসি সাহেবের সঙ্গে ইন্টারভ্যু দিয়েছে। কেউ ছাড়া পেয়েছে, কেউ হাজতে ঢুকে গেছে। আমার ভাগ্যে কি ঘটবে বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমি বসে আছি ওসি সাহেবের সামনে। জেরা করতে করতে ভদ্রলোক এখন মনে হচ্ছে কিছুটা ক্লান্ত। ঘন ঘন হাই তুলছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষদের হাই তোলার দৃশ্য অতি কুৎসিত। দেখতে ভাল লাগে না। এরা সব সময় স্মার্ট হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসবেন — ভদ্রলোক বসেছেন বাঁকা হয়ে। বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয় গত সপ্তাহে পাইলসের অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের ঘা শুকায়নি। ওসি সাহেবের চেহারায় রসকষ নেই, মিশরের মমির মত শুকনো মুখ। সেই মুখও খানিকটা কুঁচকে আছে। মনে হচ্ছে পাইলস ছাড়াও ওসি সাহেবের তলপেটে ক্রনিক ব্যথা আছে। এখন সেই ব্যথা হচ্ছে। তিনি ব্যথা সামাল দিতে গিয়ে মুখ কুঁচকে আছেন। খাকি পোশাক না পরে

পায়জামা–পাঞ্জাবি পরলে তাঁকে কেমন লাগত তাই ভাবছি। ঠিক বুঝতে পারছি না। কোন এক ঈদের দিনে এসে উনাকে দেখে যেতে হবে। সুযোগ–সুবিধা থাকলে কোলাকুলিও করব। পুলিশের সঙ্গে কোলাকুলির সৌভাগ্য এখনো হয়নি।

'বলুন, নাম বলুন। মুখ সেলাই করে বসে থাকবেন না।'

আমি আবারও কাশলাম। খাকি পোশাক পরা কাউকে আসল নাম বলতে নেই। তাদের বলতে হয় নকল নাম। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে ভুল–ভাল ঠিকানা দিতে হয়। বাসা যদি হয় মালিবাগ তাহলে বলতে হয় তল্লাবাগ। হিমু নামের বদলে তাঁকে ঝিমু বললে কেমন হয়? অনেকক্ষণ ঝিম ধরে আছি, কাজেই ঝিমু। সবচে ভাল হয় শত্রু–টাইপ কারোর নাম–ঠিকানা দিয়ে দেয়া। তেমন কারো নাম মনে পড়ছে না।

নাম শোনার জন্যে ওসি সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। এবার তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হল। খাকি পোশাক পরা মানুষের ধৈর্য কম থাকে। উনি তাও মোটামুটি ভালই ধৈর্য দেখিয়েছেন।

'নাম বলছেন না কেন? নাম বলতে অসুবিধা আছে?'

'জ্বি না স্যার।'

'অসুবিধা না থাকলে বলুন — ঝেড়ে কাশুন।'

আমি ঝেড়ে কাশলাম, বললাম — হিমু।

'আপনার নাম হিমু?'

'ইয়েস স্যার।'

'আগে–পিছে কিছু আছে, না শুধুই হিমু?'

'শুধুই হিমু। বাবা হিমালয় নাম রাখতে চেয়েছিলেন, শর্ট করে হিমু রেখেছেন।'

'শর্ট যখন করলেনই আরো শর্ট করলেন না কেন? শুধু "হি" রেখে দিতেন।'

'কেন যে "হি" রাখলেন না আমি তো স্যার বলতে পারছি না। উনি কাছে–ধারে থাকলে জিজ্ঞেস করতাম।'

'উনি কোথায়?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কোথায়। খুব সম্ভব সাতটা দোজখের যে কোন একটায় তাঁর স্থান হয়েছে।'

ওসি সাহেবের কুঁচকানো মুখ আরো কুঁচকে গেল। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক রেগে যাচ্ছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষকে কখনো রাগাতে নেই।

'আপনার ধারণা আপনার বাবা দোজখে আছেন?'

'জ্বি স্যার। ভয়ংকর পাপী মানুষ ছিলেন। দোজখ–নসিব হবারই কথা। উনি ঠাণ্ডা মাথায় আমার মা'কে খুন করেছিলেন। ৩০২ ধারায় কেইস হবার কথা। হয়নি। আমার তখন বয়স ছিল অল্প। তাছাড়া বাবাকে অত্যন্ত পছন্দ করতাম।'

'আপনার ঠিকানা কি? স্থায়ী ঠিকানা।'

'স্যার, আমার স্থায়ী ঠিকানা হল পৃথিবী। দ্যা প্ল্যানেট আর্থ।'

ওসি সাহেব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মত একটা টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। তাঁর মুখ ভয়ংকর দেখাচ্ছে। মনে হয় তলপেটের ক্রনিক ব্যথাটা তাঁর হঠাৎ বেড়ে গেছে। তিনি থমথমে গলায় বললেন, ত্যাঁদড়ামি করছ? রোলারের এক ডলা খেলে ত্যাঁদড়ামি বের হয়ে যাবে। রোলার চেন?

'জ্বি স্যার, চিনি।'

'আমার মনে হয় ভাল করে চেন না।'

পুলিশের লোকেরা যেমন অতি দ্রুত তুমি থেকে আপনি–তে চলে যেতে পারে তেমনি অতি দ্রুতই আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই–এ নেমে যেতে পারে। এই বেশ খাতির করে সিগারেট দিচ্ছে, লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে তুমি শুরু করল, তারপরই গালে প্রচণ্ড থাবড়া দিয়ে শুরু করল তুই। তখন চোখে অন্ধকার দেখা ছাড়া গতি নেই।

আমি শংকিত বোধ করছি। ওসি সাহেব হঠাৎ করে আপনি থেকে তুমি–তে চলে এসেছেন — লক্ষণ শুভ নয়। গালে থাবড়া পড়বে কি–না কে জানে। আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

'তোমার স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে পৃথিবী। দ্যা প্ল্যানেট আর্থ?'

'ইয়েস স্যার।'

'বোমা কিভাবে বানায় তুই জানিস?'

আমি আঁতকে উঠলাম — তুমি থেকে তুই–এ ডিমোশন হয়েছে। লক্ষণ খুব খারাপ। চার নম্বর বিপদ সংকেত। ঘূর্ণিঝড় কাছেই কোথাও তৈরি হয়ে গেছে। এইদিকে চলে আসতে পারে। সমুদ্রগামী সকল নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হচ্ছে।

'কি, কথা আটকে গেছে যে? বোমা বানাবার পদ্ধতি জানিস? বোমা বানাতে কি কি লাগে?'

'নির্ভর করছে কি ধরনের বোমা বানাবেন তার উপর। অ্যাটম বোমা বানাতে লাগে ক্রিটিকাল মাসের সমপরিমাণ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ। ফ্রি নিউট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু হয় . . .

'জর্দার কৌটা কিভাবে বানায়?'

'জর্দার কৌটা টাইপ বোমা বানাতে লাগে — পটাশিয়াম ক্লোরেট, সালফার, কার্বন এবং কিছু পটাশিয়াম নাইট্রেট। ক্ষেত্রবিশেষে ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যবহার না করলেই ভাল। ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করলে আপনা–আপনি বোমা ফেটে যাবার আশংকা থাকে। মনে করুন, আপনি জর্দার কৌটা পকেটে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ সম্পূর্ণ বিনা কারণে পকেটের বোমা ফেটে যাবে। ভয় পেয়ে আপনি দৌড়ে থানায় এসে দেখবেন, আপনার একটা পা উড়ে চলে গেছে।

প্রচণ্ড টেনশানের জন্যে আপনি এক পায়েই দৌড়ে চলে এসেছেন। বুঝতে পারেননি?'

ওসি সাহেব হুংকার দিলেন, রসিকতা করবি না ত্যাঁদড়ের বাচ্চা, লেবু কচলে যেমন রস বের করে — মানুষ কচলেও আমরা রস বের করি।

এইটুকু বলেই তিনি পেছন দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন, আকবর, আকবর!

আকবর কে, কে জানে? আমি ঝিম ধরে আকবরের জন্যে অপেক্ষা করছি। সাধারণত রাজা-বাদশার নাম বয়-বাবুর্চির মধ্যে বেশি দেখা যায়। চাকর-বাকর, বয়-বাবুর্চিদের নামের সত্তর ভাগ জুড়ে আছে — আকবর, শাহজাহান, জাহাঙ্গীর, সিরাজ।

আমার অনুমান সত্যি হল। আকবর বাদশা বের হয়ে এলেন। তার বয়স বারো-তেরো। পরনে হাফপ্যান্ট। গায়ে হলুদ গেঞ্জি। আকবর বাদশা সম্ভবত ঘুমুচ্ছিলেন। ঘুম এখনো কাটেনি। ওসি সাহেব হুংকার দিলেন, হেলে পড়ে যাচ্ছিস কেন? সোজা হয়ে দাঁড়া।

আকবর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিট পিট করে চারদিক দেখতে লাগল। ওসি সাহেব বললেন, চা বানিয়ে আন। হিমু সাহেবকে ফাস ক্লাস করে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া।

আকবর মাথা অনেকখানি হেলিয়ে সায় দিল। কয়েকবার চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে বিকট হাই তুলল। সে যেভাবে হেলতে দুলতে যাচ্ছে তাতে মনে হয় পথেই ঘুমিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

ওসি সাহেব আমার দিকে ফিরলেন। তিনিও অবিকল আকবরের মত হাই তুলতে তুলতে বললেন, হিমু সাহেব, আপনি চা খান। চা খেয়ে ফুটেন। ফুটেন শব্দের মানে জানেন তো?

'জানি স্যার। ফুটেন হচ্ছে পগারপার হওয়া।'

'দ্যাটস রাইট। চা খেয়ে পগারপার হন। আর ত্যাঁদড়ামি করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। ওসি সাহেব আপনি থেকে তুমি-তে নেমে আবার আপনি-তে ফিরে গেছেন। চা-টা খাওয়াচ্ছেন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। এত বোঝাবুঝির কিছু নেই। চা খেয়ে দ্রুত বিদেয় হয়ে যাওয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই জগতের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা বোঝার চেষ্টা খুব বেশি করতে নেই। জগৎ চলছে, সূর্য উঠছে-ডুবছে, পূর্ণিমা-অমাবস্যা হচ্ছে, তেমনি অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাও ঘটছে। ঘটতে থাকুক না। সব বোঝার দরকার কি? বরফ জলে ভাসে। বরফও পানি, জলও পানি। তারপরেও একজন আরেকজনের উপর দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়ানোটা ইন্টারেস্টিং। তার পেছনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা তেমন ইন্টারেস্টিং

না।

মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে কিন্তু কোন বাতাস লাগছে না। থানার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা। এক কোনায় টেবিলে ঝুঁকে বুড়োমত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বেশ নির্বিকার ভঙ্গি। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে। এই যে ওসি সাহেবের সঙ্গে আমার এত কথা হল, তিনি একবারও ফিরে তাকাননি। থানার বাইরের বারান্দায় লম্বা বেঞ্চি পাতা। সেখানে কয়েকজন পুলিশ বসে আছে। তাদের গল্পগুজব, হাসাহাসি কানে আসছে। থানার লকারে মুসল্লি-টাইপ কোন ক্রিমিন্যালকে রাখা হয়েছে। সে বেশ উচ্চস্বরে নানান দোয়া-দরুদ পড়ছে। তার গলা বেশ মিষ্টি।

আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি এবং "ত্যাঁদড়" শব্দের মানে কি তা ভেবে বের করার চেষ্টা করছি। ত্যাঁদড়ের বাচ্চা বলে গালি যেহেতু প্রচলিত, কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে ত্যাঁদড় কোন একটা প্রাণীর নাম। বাঁদর জাতীয় প্রাণী কি? বাঁদর যেমন বাঁদরামি করে, ত্যাঁদড় করে ত্যাঁদরামি। ওসি সাহেবকে ত্যাঁদড় শব্দের মানে কি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে? উনি রেগে গিয়ে আবার আপনি থেকে তুই-এ নেমে যাবেন না তো? এই রিস্ক নেয়া কি ঠিক হবে? ঠিক হবে না। তারচে বরং বাংলা ভাল জানে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া যাবে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তিনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। মারিয়ার তা-ই ধারণা।

আকবর বাদশা চা নিয়ে এসেছে। যেসব জায়গার নামের শেষে স্টেশন যুক্ত থাকে সে সব জায়গার চা কুৎসিত হয় — যেমন বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, পুলিশ স্টেশন। অদ্ভুত কাণ্ড — আকবর বাদশার চা হয়েছে অসাধারণ। এক চুমুক দিয়ে মনে হল — গত পাঁচ বছরে এত ভাল চা খাইনি। কড়া লিকারে পরিমাণমত দুধ দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। চিনি যতটুকু দরকার তারচে সামান্য বেশি দেয়া হয়েছে। মনে হয় এই 'বেশি'র দরকার ছিল। গন্ধটাও কি সুন্দর! চায়ে যে আলাদা গন্ধ থাকে তা শুধু রূপাদের বাড়িতে গেলে বোঝা যায়। তবে রূপাদের বাড়ির চায়ে লিকার থাকে না। খেলে মনে হয় পীর সাহেবের পানিপড়া খাচ্ছি। আমি আকবর বাদশাহর চায়ে গভীর আগ্রহে চুমুক দিচ্ছি। আকবর বাদশা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত হাই তুলে যাচ্ছে। সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেন বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় চা শেষ হবার পর কাপ হাতে নিয়ে বিদেয় হবে। যদিও এমন কোন মূল্যবান চায়ের কাপ না। বদখত ধরনের কাপ। খানিকটা ফাটা। ফাটা কাপে চা খেলে আয়ু কমে — খুব সুন্দর কাপে চা খেলে নিশ্চয়ই আয়ু বাড়ে। রূপাদের বাড়িতে চা খেয়ে আয়ু বাড়াতে হবে। ওদের বাড়িতেই পৃথিবীর সবচে সুন্দর কাপে চা দেয়া হয়।

ওসি সাহেব বললেন, চা-টা কেমন লাগল?

আমি বললাম, স্যার ভাল।

'কেমন ভাল?'

'খুব ভাল। অসাধারণ। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মত।'

'কোন কবিতা?'

আমি গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলাম :

> এইসব ভাল লাগে : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালী রোদ এসে
> আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল —
> এই নিয়ে খেলা করে জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল
> পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালবেসে,

ওসি সাহেব বললেন, আরেক কাপ খাবেন?

'জ্বি না।'

'কবিতার মত চা যখন — গোটা পাঁচ-ছয় কাপ খান।'

'পরের কাপটা হয়ত ভাল হবে না। আমার ধারণা চা এখানে ভাল হয় না। আজ হঠাৎ করে হয়ে গেছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর পড়ে গেছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটি বলে, এক লক্ষ কাপ চা যদি বানানো হয় তা হলে এক লক্ষ কাপ চায়ের ভেতর এক কাপ চা হবে অসাধারণ।'

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, সায়েন্স কপচাবি না। সায়েন্স গুহ্যদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, জ্বি আচ্ছা, স্যার।

'এখন বল্, তোদের বোমা বানাবার কারখানাটা কোথায়? সাঙ্গপাঙ্গদের নাম বল্। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝেড়ে কাশবি, নয়ত ঠেলার চোটে চা যে খেয়েছিস, সেই চা নাক-মুখ দিয়ে বের হবে। শুরু কর্।'

কি সর্বনাশের কথা — আমার ব্রহ্মতালু শুকিয়ে ওঠার উপক্রম হল। এ কি সমস্যায় পড়া গেল! ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, নিজ থেকে কথা বলতে চাইলে ভাল কথা, নয়তো রোলারের গুঁতা দিয়ে সব বের করব। নাভির এক ইঞ্চি উপরে একটা গুঁতা দিলে আর কিছু দেখতে হবে না। গত জন্মের কথাও বের হয়ে আসবে।

আমি শুকনো গলায় বললাম, স্যার, একটা টেলিফোন করতে পারি?

ওসি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, কাকে টেলিফোন করবি? কোন মন্ত্রীকে? পুলিশের আইজিকে? আর্মির কোন জেনারেলকে? টেলিফোন এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান — তোকে অ্যারেস্ট করার জন্য ধমক খেতে খেতে আমার অবস্থা কাহিল হবে — বদলি করে দেবে চিটাগাং হিলট্র্যাক্টে? শান্তিবাহিনীর বোমা খেয়ে

চিৎ হয়ে পড়ে থাকব?

'স্যার, আমি খুবই লোয়ার লেভেলের প্রাণী। প্রায় শিম্পাঞ্জীদের কাছাকাছি। হাইয়ার লেভেলের কাউকে চিনি না।'

'তাহলে কাকে টেলিফোন করতে চাচ্ছিস?'

'এমন কাউকে টেলিফোন করব যে আমার চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেবে —'

'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট?'

'জ্বি।'

'তোর টেলিফোনের পর হোম মিনিস্টার আমাকে ধমকাধমকি করবে না?'

'জ্বি না, স্যার। সম্ভাবনা হচ্ছে, একটা মেয়ে খুব মিষ্টি গলায় আপনাকে আমার সম্পর্কে দু'-একটা ভাল কথা বলবে।'

'মেয়েটি কে? প্রেমিকা?'

'জ্বি না — আমি লোয়ার লেভেলের প্রাণী। প্রেম করার যোগ্যতা আমার নেই। প্রেম অতি উচ্চস্তরের ব্যাপার।'

'তোর যোগ্যতা কি?'

'আমার একমাত্র যোগ্যতা আমি হাঁটতে পারি। কেউ চাইলে ছায়ার মত পাশে থাকি। আমি হচ্ছি স্যার ছায়া-সঙ্গি।'

ওসি সাহেব গম্ভীর মুখে টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। থানার ঘড়িতে রাত একটা বাজে। কাকে টেলিফোন করব বুঝতে পারছি না। রূপাকে করা যায়। এত রাতে টেলিফোন করলে রূপা ধরবে না। রূপার বাবা ধরবেন এবং আমার নাম শুনেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখবেন। ফুপুর বাসায় করা যায়। ফুপু টেলিফোন ধরবেন। ঘুম-ঘুম স্বরে বলবেন, কে, হিমু? কি ব্যাপার?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করার পর তিনি হাই তুলতে তুলতে বলবেন, তোকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে এটা তো নতুন কিছু না। প্রায়ই ধরে। রাতদুপুরে টেলিফোন করে বিরক্ত করছিস কেন?

এই দুইজন ছাড়া আর কাউকে টেলিফোন করা সম্ভব না, কারণ আর কারো টেলিফোন নাম্বার আমি জানি না। মারিয়াকে করব? এম্নিতেও ওর খোঁজ নেয়া দরকার। দু'শ কিলোমিটার স্পীডে চলার পর কি হল? পৌঁছতে পেরেছে তো ঢাকায়? পথে কোন বোমা-টোমা খায়নি? মারিয়ার টেলিফোন নাম্বারটা মনে করতে হবে। পাঁচ বছর আগে একটা পদ্ধতি শিখিয়েছিল। এসোসিয়েশন অব আইডিয়া পদ্ধতি। নাম্বারটা হচ্ছে প্রথমে আট তারপর আমি, তুমি, আমি, তুমি, আমরা। আমি হচ্ছে ১, তুমি হচ্ছে ২, আমরা হচ্ছে ৩ ; তাহলে নাম্বারটা হল ৮ ১২ ১২৩.

ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে মারিয়া ধরল। আমি খুশি খুশি গলায় বললাম,

কেমন আছিস?

মারিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, কেমন আছিস মানে? আপনি কে? হু আর ইউ?

'আমি হিমু।'

'রাত একটার সময় টেলিফোন করেছেন কেন?'

'খোঁজ নেবার জন্যে — তোর দু'শ কিলোমিটার স্পীডে ভ্রমণ কেমন হল?'

'রাত একটার সময় সেটা টেলিফোন করে জানতে হবে?'

'তোর টেলিফোন নাম্বারটা মনে আছে কি–না সেটাও ট্রাই করলাম। এক কাজে দু' কাজ।'

'এখনো তুই তুই করছেন?'

'আচ্ছা, আর করব না।'

'কোত্থেকে টেলিফোন করছেন?'

'রমনা থানা থেকে। পুলিশের ধারণা আমি বোমা–টোমা বানাই। ধরে নিয়ে এসেছে। এখন জেরা করছে।'

'ধোলাই দিয়েছে?'

'এখনো দেয়নি। মনে হয় দেবে। তুই কি একটা কাজ করতে পারবি? ওসি সাহেবকে মিষ্টি গলায় বলবি যে বোমা–টোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি অতি সাধারণ, অতি নিরীহ হিমু। একটুর জন্যে মহাপুরুষ হতে গিয়ে হতে পারিনি।'

'আপনি তো সারাজীবন নানান ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছেন — পুলিশের হাতে ধরা খাওয়া তো ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা। বের হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?'

'এক জায়গায় একটা দাওয়াত ছিল। বলেছিলাম রাত করে যাব। ভদ্রলোক না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

'ভদ্রলোকের টেলিফোন নাম্বারটা দিন। টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি আপনি পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন। আসতে পারবেন না।'

'তোর কি ধারণা বাংলাদেশের সবার ঘরেই টেলিফোন আছে?'

'হিমু ভাই, আপনি এখনো কিন্তু তুই তুই করছেন। কেন করছেন তাও আমি জানি। মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপনি আনন্দ পান। কখনো তুমি, কখনো তুই বলে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এক সময় আমি নিতান্তই একটা কিশোরী ছিলাম। বিভ্রান্ত হয়েছি। বিভ্রান্ত হবার স্টেজ আমি পার হয়ে এসেছি। অনেক কথা বলে ফেললাম। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। রাখি?'

'আচ্ছা — তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে কি করছিলি?

'গান শুনছিলাম।'

'কার গান?'

'নীল ডায়মন্ড। গানের কথা শুনতে চান?'

'বল্।'

"What a beautiful noise
coming out from the street
got a beautiful sound
its got a beautiful beat
its a beautiful noise."

'কথা তো শুনলেন। এখন তাহলে রাখি?'

'আচ্ছা।'

খট শব্দ করে মারিয়া টেলিফোন রেখে দিল।

ওসি সাহেব বললেন, টেলিফোনে কোন মন্ত্রী–মিনিস্টার পাওয়া গেল?

'জ্বি না।'

'আপনার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবে এমন কাউকেও পাওয়া গেল না?'

ওসি সাহেব আবার তুই থেকে আপনি–তে চলে এসেছেন। জোয়ার–ভাটার খেলা চলছে। খেলার শেষটা কি কে জানে। ওসি সাহেব বললেন, কি, কথা বলুন, সুপারিশের লোক পাওয়া গেল না?

'একজনকে পেয়েছিলাম, সে সুপারিশ করতে রাজি হল না।'

'খুবই দুঃসংবাদ।'

'জ্বি, দুঃসংবাদ।'

'আমাদের থানার রেকর্ড অফিসার বলল, আপনাকে এর আগেও কয়েকবার ধরা হয়েছে।'

'উনি ঠিকই বলেছেন। আমি নিশাচর প্রকৃতির মানুষ তো — রাতে হাঁটি। রাতে যারা হাঁটে পুলিশ তাদের পছন্দ করে না। পুলিশের ধারণা রাতে হাঁটার অধিকার শুধু তাদেরই আছে।'

'বিটের কনস্টেবলরা বলছিল আপনার না–কি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। সত্যি আছে না–কি?'

'নেই স্যার। হাঁটার ক্ষমতা ছাড়া আমার অন্য কোন ক্ষমতা নেই।'

'রোলারের দুই গুঁতা জায়গামত পড়লে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বের হয়ে যায়।'

'যথার্থ বলেছেন স্যার।'

'আপনার প্রতি আমি সামান্য মমতা অনুভব করছি। কেন বলুন তো?'

'আমার কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই — থাকলে সেই ক্ষমতা অ্যাপ্লাই করে আমার মত অভাজনের প্রতি আপনার মমতার কারণ বলে দিতে পারতাম।'

'আপনার প্রতি মমতা বোধ করছি, কারণ আমার জানামতে আপনি হচ্ছেন

থানায় ধরে আনা প্রথম ব্যক্তি, যার পক্ষে কথা বলার জন্যে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ এমন এক দেশ, যে দেশে পুলিশের হাতে কেউ ধরা পড়লেই, মন্ত্রী–মিনিস্টার, সেক্রেটারি, মিলিটারি জেনারেলের একটা সাড়া পড়ে যায়। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে থাকে। শুনুন হিমু সাহেব, চলে যান। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'থ্যাংক য়্যু স্যার।'

'যাবেন কি ভাবে? গাড়ি–রিকশা সবই তো বন্ধ।'

'হেঁটে হেঁটে চলে যাব। কোন সমস্যা নেই।'

'আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। পুলিশের জীপ দিচ্ছি, আপনি যেখানে যেতে চান নামিয়ে দেবে। যাবেন কোথায়?'

'কাওরান বাজার। আসগর নামের এক ভদ্রলোকের বাসায় আমার দাওয়াত।'

'যান, দাওয়াত খেয়ে আসুন।'

আমি পুলিশের জীপে উঠে বসলাম। সেন্ট্রি পুলিশ আমাকে তালেবর সাইজের কেউ ভেবে স্যালুট দিয়ে বসল। রোলারের গুঁতার বদলে স্যালুট। বড়ই রহস্যময় দুনিয়া!



পুলিশের গাড়ি আমাকে কাওরান বাজার নামিয়ে দিয়ে গেল। ড্রাইভারের গায়েও খাকি পোশাক। সে বেশ আদবের সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে নামতে সাহায্য করল। তারপরই এক স্যালুট। আমি অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকালাম — কেউ দেখে ফেলছে না তো? পুলিশ আদবের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামাচ্ছে, স্যালুট দিচ্ছে — খুবই সন্দেহজনক। রাত প্রায় দু'টা — কারো জেগে থাকার কথা না। আন্দোলনের সময় সারাদিন লোকজন ব্যস্ত থাকে। টেনশানঘটিত ব্যস্ততা। রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকার খবর শোনার পর সবার মধ্যে খানিকটা ঝিম ঝিম ভাব চলে আসে। আন্দোলনের খবর যত ভয়াবহই হোক, সবাই খুব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে চলে যায়। দেশে কোন আন্দোলন চলছে কি–না তা বোঝার উপায় হল রাত বারোটার পর পথে বের হওয়া। যদি দেখা যায় সব খা খা করছে, তাহলে বুঝতে হবে কোন আন্দোলন চলছে। পানের দোকানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভিড় জমে থাকলেও আন্দোলন হচ্ছে ধরে নেওয়া যায়। বিবিসি–র দিকে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে লোকজন কান পেতে থাকে। আমার নিজের ধারণা, কোন এক এপ্রিল–ফুলের রাতে বিবিসি যদি মজা করে বলে — বাংলাদেশে সরকার পতন হয়েছে, তাহলে সরকারের পতন হয়ে যাবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারী বাড়ি ছেড়ে অতি দ্রুত কোন আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবেন। কেউ কোন উচ্চবাচ্য করবে না। বাংলাদেশ টিভি থেকে বলা হবে — বিবিসির খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতায় কে আছেন তা তাঁরা বলেননি বলে এই বিষয়ে আমরাও কিছু বলতে পারছি না।

আমার চারপাশে কেউ ছিল না। একটা কুকুর ছিল, সে পুলিশের গাড়ি দেখে দ্রুত ডাস্টবিনের আড়ালে চলে গেল। যতক্ষণ গাড়ি থেমে রইল ততক্ষণ আর তাকে দেখা গেল না। গাড়ি চলে যাবার পরই সে মাথা বের করে আমাকে দেখল। আমি বললাম, এই আয়। সে কিছু সন্দেহ, কিছু শংকা নিয়ে বের হয়ে এল। লেজ নাড়ছে না — এর অর্থ হচ্ছে আমার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। পুলিশের গাড়ি যাকে নামিয়ে দিয়ে যায় তার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষেও সম্ভব না। কুকুরের সঙ্গে আমি কিছু কথাবার্তা চালালাম।

'কি রে, তোর খবর কি? রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে?'

(কুকুর স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। ভাবছে।)

'তুই কি এই দিকেরই? রাতে ঘুমাস কোথায়?'

(এখন লেজ একটু নড়ল।)

'আমি গলির ভেতর ঢুকব। একা ভয় ভয় লাগছে। তুই আমাকে একটু এগিয়ে দে।'

(লেজ ভালমত নড়া শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে সে গ্রহণ করেছে বন্ধু হিসেবে।)

'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন? তোর পায়ে কি হয়েছে?'

(প্রবল লেজ নাড়ার সঙ্গে এইবার সে কুঁই কুঁই করল। অর্থাৎ পায়ে কি সমস্যা সেটা বলল। কুকুরের ভাষা জানা নেই বলে বুঝতে পারলাম না।)

মনে হয় তার পায়ে কেউ গরম ভাতের মাড় ঢেলে দিয়েছে। গরম মাড় কিংবা গরম পানি কুকুরের গায়ে ফেলে আমরা বড় আনন্দ পাই। ব্যথা–যন্ত্রণায় সে ছটফট করে — দেখে আমাদের বড়ই ভাল লাগে। মানুষ হিসেবে সমগ্র পশুজগতে আমরা শ্রেষ্ঠ, সেটা আবারও প্রমাণিত হয়।

আমার ধারণা, নিম্নশ্রেণীর পশু বলে আমরা যাদের আলাদা করছি, তাদের আলাদা করা ঠিক হচ্ছে না। মানুষ হিসেবে আমরা এমন কিছু এগিয়ে নেই। আমাদের বুদ্ধি বেশি বলে আমরা অহংকার করি — ওদের যে বুদ্ধি কম সেটা কে বলল? "আমাদের লজিক আছে, ওদের নেই?" — এটাও কি নিতান্তই একটা বাজে কথা না? আমরা কি কখনো ওদের মাথার ভেতর ঢুকতে পেরেছি যে বলব — ওদের লজিক নেই? "আমাদের ভাষা আছে, ওদের নেই?" — আরেকটি নিতান্তই হাস্যকর কথা। ওদের ভাষা অবশ্যই আছে। একটা কুকুর অন্য একটা কুকুরের সাথে নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলে। আমরা যখন শুনি তখন মনে হয় শুধুই ঘেউ ঘেউ করছে। দু'জন চাইনীজ কিংবা জাপানীজকে যখন কথা বলতে শুনি তখন মনে হয় এরা কিছুই বলছে না, শুধু 'চেং বেং' টাইপ শব্দ করছে। ওদের চেং বেং–এর সঙ্গে ঘেউ ঘেউ–এর তফাৎটা কোথায়?

পশুদের বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, চিন্তাশক্তি আছে। সব জেনেও এদের আমরা অস্বীকার করি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে। অস্বীকার না করলে এদের হত্যা করে আমরা খেতে পারতাম না। আমাদের লজ্জা করত।

খোঁড়া কুকুরটা আমার আগে আগে যাচ্ছে। মনে হয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত সে আগেও আমাকে এ অঞ্চলে আসতে দেখেছে। সে মনে করে রেখেছে। সে জানে আমি কোথায় যাব, তাই আগে আগে নিয়ে যাচ্ছে। নয়ত পেছনে পেছনে আসত। পথে আরো কয়েকটা কুকুর পাওয়া গেল। তারা ঘেউ ঘেউ করে ওঠার আগেই আমার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করল। হয়ত বলল, "ঝামেলা করিস না, আমার

চেনা লোক"।

তারাও ঝামেলা করল না। মাথা উঁচু করে আমাকে দেখে আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমার কুকুরটা আমার দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করল। এর অর্থ সম্ভবত — "রাতদুপুরে এভাবে হাঁটাহাঁটি করবে না। দেশের অবস্থা ভাল না। আইন–শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। বড় আফসোস! সরকার আর বিরোধী দলে কবে যে মিটমাট হবে!"

আমি কুকুরের পেছনে পেছনে আসগর সাহেব যে গলিতে থাকেন সেই গলি বের করার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা জটিল। শাখা নদীর উপশাখা থাকে — সেই উপশাখা থেকেও শাখা বের হয়, যাকে বলা চলে উপ–উপশাখা। আসগর সাহেবের গলিও তেমনি উপ–উপগলি। ঢাকা শহরের সবচে সরু এবং সবচে দীর্ঘ গলি। শুধু যে দীর্ঘ গলি তা না, সবচে দীর্ঘ ডাস্টবিনও। গলির দু'পাশের বাসিন্দারা তাদের যাবতীয় আবর্জনা কষ্ট করে দূরে নিয়ে ফেলে না, গলিতেই ঢেলে দেয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি তাতে কিছু মনে করে না। সম্ভবত তাদের খাতায় গলিটির নাম নেই। নাম না থাকাটাও আশ্চর্যের কিছু না। কারণ গলিটার আসলেই কোন নাম নেই। কোন একদিন এই গলিতে বিখ্যাত কেউ জন্মাবে, তখন হয়তো নাম হবে। কুখ্যাতদের গলির নাম হলে অবশ্যি এখনই এই গলির নাম রাখা যায় — "কানা কুদ্দুস লেন"। কানা কুদ্দুস কাওরান বাজার এলাকার ত্রাস। মানুষ-খুনকে সে মোটামুটি একটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার মোটামুটি ভাব আছে। দিনের বেলা সে বেঙ্গল মোটর নামে মোটর পার্টসের দোকানে বসে থাকে। সে অতি বিনয়ী, আচার–ব্যবহার বড়ই মধুর। দেখা হলেই সে আমাকে প্রায় জোর করে চা, মোগলাই পরোটা খাওয়ায়।

গলিটা আমার খুব প্রিয়, কারণ এই গলিতে রিকশা ঢুকতে পারে না। এখানে সব সময়ই হরতাল। শিশুরা প্রায়ই ইটের স্টাম্প বানিয়ে ক্রিকেট খেলে। এখানে এলেই আমি আগ্রহ নিয়ে তাদের খেলা দেখি। একবার আমি তাদের আম্পায়ার হিসেবেও কাজ করেছি। পক্ষপাতদুষ্ট আম্পায়ারিং–এ একটা রেকর্ড সেবার করেছিলাম। বোল্ড আউট হয়ে গেছে, ইটের স্টাম্প বলের ধাক্কায় উড়ে চলে গেছে। আমি তাকিয়ে দেখি শিশু ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট হাতে কাঁদো কাঁদো চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি তখন অবলীলায় কঠিন মুখে বলেছি — নো বল হয়েছে, আউট হয়নি। শিশু ব্যাটস্‌ম্যানের চোখে গভীর আনন্দ। ফিল্ডাররা চেঁচামেচি করছে। আমি দিয়েছি ধমক — তোমরা বেশি জান? আমি ঢাকা লীগের আম্পায়ার। আমার চোখের সামনে নো বল করে পার হয়ে যাবে, তা হবে না। স্টার্ট দ্য গেম। নো হাংকি পাংকি।

এরা আমার হুকুম মেনে নিয়েছে। বয়স্ক একজন মানুষ তাদের খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েছে — এতেই তারা আনন্দিত। বয়স্ক মানুষদের ভুল–ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর

চোখে দেখতে হয়। শিশুরা জানে বয়স্ক মানুষরা ভুল করে, জেনেশুনে ভুল করে। শিশুরাই শুধু জেনেশুনে কোন ভুল করে না।

আসগর সাহেবকে তাঁর বাসায় পাওয়া গেল না। দরজায় মোটা তালা ঝুলছে। এরকম হবার কথা না। আসগর সাহেব রুটিন-বাঁধা জীবনযাপন করেন। ন'টার আগেই জিপিওতে চলে যান। ফেরেন সন্ধ্যায়। রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন। ঘর থেকে বের হন না। গত আঠারো বছরে এই রুটিনের ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর নিজের কোন সংসার নেই। জীবনের একটা পর্যায়ে হয়ত বিয়ে করে সংসার করার কথা ভেবেছেন। এখন ভাবেন না। ভাবার কথাও না। এখন হয়ত মৃত্যুর কথা ভাবেন। একদিন মৃত্যু হবে, যেহেতু সৎ জীবনযাপন করেছেন, সেহেতু মৃত্যুর পর বেহেশত-নসিব হবেন। সেখানে সুখের সংসার পাতবেন। এই জীবনে যা করা হয়নি, পরের জীবনে তা করা হবে।

ভদ্রলোক যে অতি সৎভাবে জীবনযাপন করেছেন তা সত্যি। চিঠি লিখে সামান্য যা রোজগার করেছেন — তার সিংহভাগ দেশে পাঠিয়েছেন। একবেলা খাওয়া অভ্যাস করেছেন। এতে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে। স্বাস্থ্য ভাল থাকুক বা না থাকুক, খরচ অবশ্যই বাঁচে। তিনি খরচ বাঁচিয়েছেন। খরচ বাঁচিয়েছেন বলেই ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা করাতে পেরেছেন। তারা আজ প্রতিষ্ঠিত।

এক ভাই সরকারী ডাক্তার। কুড়িগ্রাম সরকারী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার। অন্য ভাই এক কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছোট ভাইরা এখন বড় ভাইয়ের পেশা নিয়ে লজ্জা বোধ করে। তাদের খুব ইচ্ছা বড়ভাই দেশের বাড়িতে গিয়ে স্থায়ী হোন। দেশের বাড়ি ভাইরা মিলে ঠিকঠাক করেছে। পুকুর কাটিয়ে মাছ ছেড়েছে। জমিজমাও কিছু কেনা হয়েছে। আসগর সাহেব নিজেও চান গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে। তাঁর বয়স হয়েছে — শরীর নষ্ট হয়েছে, খুবই ক্লান্ত বোধ করেন। বড় ধরনের অসুখ-বিসুখও হয়েছে হয়ত। ডাক্তার দেখান না বলে অসুখ ধরা পড়েনি। শরীরের এই অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে থাকাটা আসগর সাহেবের জন্যে আনন্দের ব্যাপার হবার কথা। ভাইবোনরা তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণ শ্রদ্ধা করে। এই মানুষটি তাদের বড় করার জন্যে বিয়ে-টিয়ে কিছু করেননি — সারাজীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, এই সত্য তারা সব সময় স্বীকার করে।

আলি আসগর দেশে যেতে পারছেন না। বিচিত্র এক ঝামেলায় তিনি ফেঁসে গেছেন। ঝামেলাটা হয়েছে সাত বৎসর আগে। দিন-তারিখ মনে নেই তবে বৃহস্পতিবার ছিল এটা তাঁর মনে আছে। তিনি তাঁর নিজের জায়গায় টুলবক্স নিয়ে বসে আছেন, লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা এক লোক এসে সামনে উবু হয়ে বসল। সে কিছু টাকা মনিঅর্ডার করতে চায়। টাকার পরিমাণ সাত হাজার এক টাকা। লোকটি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বিড় বিড় করে বলল, অনেক কষ্ট কইরা ট্যাকাগুলান জমাইছি ভাইসাব — পরিবাররে পাঠামু। ট্যাকা কেমনে পাঠায় জানি না। আপনে ব্যবস্থা কইরা দেন।

আপনের পায়ে ধরি।

বলে সত্যি সত্যি সে তাঁর পা চেপে ধরল। আসগর সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, করেন কি, করেন কি!

'গরীব মানুষ ভাইসাব, টেকাগুলান সম্বল। বড় কষ্ট কইরা জমাইছি, কেমনে পাঠামু জানি না।'

'আপনার নাম কি?'

'মনসুর।'

'মনসুর, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোন সমস্যা না। ঠিকমত নাম-ঠিকানা বলেন। কার নামে পাঠাবেন?'

'পরিবারের নামে।'

'পরিবারের নাম কি?'

'জহুরা খাতুন।'

'গ্রাম, পোস্টাপিস সব বলেন . . .। আচ্ছা দাঁড়ান, মনিঅর্ডার ফরম আগে নিয়ে আসি।'

মনিঅর্ডার ফরম আনতে গিয়ে দেখা গেল বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। সব বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবারের আগে মনিঅর্ডার করা যাবে না। আসগর সাহেব বললেন, ভাই, আপনি শনিবার সকাল দশটার মধ্যে চলে আসবেন। আমি মনিঅর্ডার করে দেব। কোন টাকা লাগবে না। বিনা টাকায় করব। চা খাবেন? চা খান।

লোকটা চা খেল। তার মনে হয় কিছু সমস্যা আছে। চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ কাঁদল। চলে যাবার সময় আসগর সাহেবকে অবাক করে দিয়ে বলল, ভাইজান, ট্যাকাগুলান সাথে নিয়া যাব না। আমার অসুবিধা আছে। আপনের কাছে থাউক। আমি শনিবারে আসমু।

আসগর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার কাছে টাকা রেখে যাবেন? এতগুলো টাকা?

লোকটা আগের মত অস্পষ্ট গলায় বিড় বিড় করে বলল, জ্বি ভাইজান। কোন উপায় নাই। গরীবের বহুত কষ্টের ট্যাকা। আপনের হাতে দিয়া গেলাম ভাইজান — আমি শনিবারে আসমু।

লোকটি আর আসেনি। আসগর সাহেব সাত বৎসর টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। লোকটা আসছে না বলে তিনি দায়মুক্ত হয়ে দেশের বাড়িতে যেতে পারছেন না। সম্পূর্ণ অকারণে তিনি অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের নিজেদের তেমন কোন সমস্যা থাকে না। তারা নিজের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অদ্ভুত সব সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। নিজেকে কিছুতেই অন্যের সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে না। হাজার চেষ্টা করেও না।

আসগর সাহেবের ঘর দোতলায়। একতলায় দর্জির একটা দোকান — দর্জির নাম বদরুল মিয়া। বদরুল মিয়া পরিবার নিয়ে দোতলায় থাকেন। তিনি তাঁর একটা ঘর সাবলেট দিয়েছেন আলি আসগরকে। রাত আড়াইটা বাজে — এই সময়ে বদরুল মিয়াকে ডেকে তুলে আসগর সাহেব সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কি–না বুঝতে পারছি না। বদরুল মিয়া অবশ্যি এম্নিতে খুব মাইডিয়ার ধরনের লোক। বয়স পঞ্চাশের উপরে। ছোটখাট হাসিখুশি মানুষ। মাথায় টুপি পরে হাসিমুখে অনবরত ঘটাং ঘটাং করে পা–মেশিন চালান। বদরুল মিয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি মেয়েদের ব্লাউজ ছাড়া অন্য কিছু বানাতে পারেন না। কিংবা পারলেও বানান না। ব্লাউজ মনে হয় তিনি ভাল বানান। তাঁর দোকানে মেয়েদের ভিড় লেগেই থাকে। মেয়েরাও তাঁকে খুব পছন্দ করে। তাঁকে বদরুল চাচা না ডেকে 'নূর চাচা' ডাকে। কারণ বদরুল মিয়ার চেহারা দেখতে অনেকটা অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের মত।

আমি বদরুল মিয়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম — নূর চাচা আছেন না–কি? সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বদরুল মিয়া বের হয়ে এলেন। মনে হয় জেগেই ছিলেন। গভীর রাতে ডেকে তোলার জন্যে তাঁকে মোটেই বিরক্ত মনে হল না। বরং মনে হল তিনি আমাকে দেখে গভীর আনন্দ পেয়েছেন। মেয়েদের ব্লাউজের কারিগররা হয়ত আনন্দময় ভুবনে বাস করেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, ব্যাপার কি হিমু ভাই?

'আসগর সাহেবের খোঁজে এসেছিলাম। ঘর তালাবন্ধ। খবর জানেন কিছু?'

'জ্বি না, কিছুই জানি না। আজ দোকান বন্ধ করেছি বারটার সময়। তখনো দেখি আসেন নাই। এ রকম কখনো হয় না। উনি সন্ধ্যার সময় চলে আসেন। আমি নিজেও চিন্তাযুক্ত। দেশের অবস্থা ভাল না। আবার দিয়েছে হরতাল।'

'বারটার সময় দোকান বন্ধ করেছেন, আপনার কাজের চাপ মনে হয় খুব বেশি।'

বদরুল মিয়া আনন্দে হেসে ফেলে বললেন, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। ব্যবসা মাশাল্লাহ্‌ ভাল হচ্ছে। আন্দোলন–টান্দোলনের সময় মেয়েছেলেরা কাপড় বেশি বানায়।

'কাপড় না, ব্লাউজ মনে হয় বেশি বানায়।'

বদরুল মিয়া আবারো মিষ্টি করে হাসলেন। আমি বললাম, আচ্ছা নূর চাচা, আপনার এই অঞ্চলের সব মেয়েদের বুকের মাপ আপনি জানেন, তাই না?

'এইটা জানতেই হয় — মাপ লাগে।'

'এই অঞ্চলের সবচে বিশালবক্ষা তরুণীর নাম কি?'

বদরুল মিয়া আবারো বিনীত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিছু বললেন না। গলা খাকারি দিয়ে হাসি বন্ধ করলেন। আমি বললাম, প্রফেশনাল এথিক্স। নাম বলবেন না। খুব ভাল। নূর চাচা, যাই?

'আসগর ভাইকে কিছু বলতে হবে?'

'জ্বি না, কিছু বলতে হবে না।'

'একটু সাবধানে যাবেন হিমু ভাই। সময় খারাপ — গত রাত তিনটার দিকে একটা মার্ডার হয়েছে। কানা কুদ্দুসের কাজ। মাথা কেটে নিয়ে গেছে। শুধু বডি ফেলে গেছে।'

'কানা কুদ্দুস আমাকে বোধহয় মার্ডার করবে না। যাই, কেমন? এত রাতে ঘুম ভাঙালাম — কিছু মনে করবেন না।'

'জ্বি না, এটা কোন ব্যাপার না। জেগেই ছিলাম, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলাম। সময় তো ভাই হয়ে এসেছে — আল্লাহ্‌পাকের সামনে দাঁড়াব — কি বলব এই নিয়ে চিন্তাযুক্ত থাকি। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ওনার দরবারে কান্নাকাটি করি।'

গলিতে নেমে দেখি, কুকুরটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সে আমাকে নিয়ে এসেছে, কাজেই নিয়ে যাবার দায়িত্বও বোধ করছে। আমি কুকুরটাকে বললাম, চল যাই। যার খোঁজে এসেছিলাম তাকে পাওয়া গেল না।

সে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আমি হাঁটছি, সে আসছে আমার পেছনে পেছনে — তার সঙ্গে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। বার বার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হচ্ছে।

'আসগর সাহেবের জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে, কি করি বল তো?'

(কুকুরটা মাথা নাড়ল। আমার চিন্তা মনে হয় তাকেও স্পর্শ করেছে।)

'আমার কি ধারণা জানিস? আমার ধারণা তিনিও আমার মত পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন। জিরো পয়েন্ট জায়গাটা হচ্ছে গণ্ডগোলের আখড়া। বের হয়েছে আর পুলিশ ধরেছে। নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের গুঁতা খেয়ে পুলিশ হাজতে হাত–পা এলিয়ে মনে হয় পড়ে আছেন। তোর কি মনে হয়?'

(ঘেউ ঘেউ উ উ উ। কুকুরের ভাষায় এই শব্দের কি মানে কে বলবে!)

'আমার ইনটুইশান বলছে রমনা থানায় গেলে আসগর সাহেবের খোঁজ পাব। তবে যেতে ভয় লাগছে। প্রথমবার ভাগ্যগুণে ছাড়া পেয়েছি, আবার পাব কি–না কে জানে। অন্যের ব্যাপারে আমার ইনটুইশান কাজ করে। নিজের ব্যাপারে কাজ করে না। এই হচ্ছে সমস্যা — বুঝলি?'

কুকুরটা আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি তার গায়ে হাত দিয়ে

আদর করলাম। বললাম, আজ যাই, পরে একদিন তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসব। কাবাব হাউজের ভাল কাবাব। শিক কাবাব আর নান রুটি। তুই ভাল থাকিস। খোঁড়া পা নিয়ে এত হাঁটাহাঁটি করিস না। পা-টার রেস্ট দরকার।

আমি রওনা দিয়েছি রমনা থানার দিকে। কুকুরটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে যতক্ষণ দেখা যাবে ততক্ষণই সে দাঁড়িয়ে থাকবে।

যেতে যেতে মারিয়ার কথা কি ভাবব? অফ করা সুইচ অন করে দেব? একটা ইন্টারেস্টিং চিঠি মেয়েটা লিখেছিল। সাংকেতিক ভাষার চিঠি। কিছুতেই তার অর্থ বের করতে পারি না। দিনের পর দিন কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে বসে থাকি। শেষে এমন হল অক্ষরগুলি মাথায় গেঁথে গেল। মস্তিষ্কের নিউরোন একটা স্পেশাল ফাইল খুলে সেই ফাইলে চিঠি জমা করে রাখল। ফাইল খুলে চিঠিটা কি দেখব? দেখা যেতে পারে।

EFBS IJNV WIBJ,
TPNFUIJOH WFSZ TUSBOHF IBT
IBQQFOE UP NF. J BN JO
MPWF XJUI ZPV. QMFBTF IPME
NF JO ZPVS BSNT.
NBSJB

এই সাংকেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করে আমার ফুপাতো ভাই বাদল। তার সময় লাগে তিন মিনিটের মত। ঐ প্রসঙ্গে ভাবতে ইচ্ছা করছে না। আমি মাথার সব ক'টা সুইচ অফ করে দিলাম।

প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। দুপুরে কি কিছু খেয়েছি? না, দুপুরে খাওয়া হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা আমার এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। টাকা পয়সার খুব সমস্যা যাচ্ছে। বড় ফুপা (বাদলের বাবা) আগে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দিতেন। এই শর্তে দিতেন যে, আমি বাদলের সঙ্গে দেখা করব না। আমার প্রচণ্ড রকম দূষিত সম্মোহনী ক্ষমতা থেকে বাদল রক্ষা পাবে। আমি শর্ত মেনে দূরে দূরে আছি। মাস শেষে ফুপার অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসি। গত দু'মাস হল ফুপা টাকা দেয়া বন্ধ করেছেন। শেষবার টাকা আনতে গেলাম, ফুপা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন — মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, তুমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছ, কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই দেশের শতকরা ত্রিশ ভাগ লোক ভিক্ষা করে জীবনযাপন করছে। কাজেই আমি খারাপ কিছু দেখছি না।

'তোমার শরীর ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, পড়াশোনা করেছ — তুমি যদি ভিক্ষা করে

বেড়াও, সেটা দেশের জন্য খারাপ।'

'অর্থাৎ আপনি আমাকে মানথ্‌লি অ্যালাউন্স দেবেন না।'

'ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন — কয়েক মাস তোমাকে টাকা দিয়েছি ওম্নি তোমার ধারণা হয়ে গেছে টাকাটা তোমার প্রাপ্য? এটা তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, টাকা কষ্ট করে রোজগার করতে হয়। একজন মাটি-কাটা শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি কেটে কত পায় জান? মাত্র সত্তর টাকা। তুমি কি মাটি কাটছ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কি? চা দিতে বলেন। চা খেয়ে বিদেয় হয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও।'

'বাদলের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। ও আছে কেমন? ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। কখন গেলে ওকে পাওয়া যায়?'

ফুপা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন। আমি তার দুই দফা হাসিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

'হিমু!'

'জ্বি ফুপা।'

'আমার বাড়িতে আসার ব্যাপারে তোমার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা এখন তুলে নেয়া হল — তুমি যখন ইচ্ছা আসতে পার।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, বাদল কি দেশে নেই?

ফুপা আবারো তাঁর বিখ্যাত হাসি হেসে বললেন — না। তাকে দেশের বাইরে পড়তে পাঠিয়েছি। তোমার হাত থেকে ওকে বাঁচানোর একটাই পথ ছিল।

'ভাল করেছেন।'

'ভাল করেছি তো বটেই। এখন চা খাও — চা খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

'চায়ের সঙ্গে হালকা স্ন্যাকস কি পাওয়া যাবে ফুপা?'

'নো স্ন্যাকস। চা যে খেতে দিচ্ছি — এটাই কি যথেষ্ট না?'

'যথেষ্ট তো বটেই।'

আমি ফুপার অফিস থেকে চা খেয়ে চলে এসেছি। আমার বাঁধা রোজগার বন্ধ। তাতে খুব যে ঘাবড়ে গেছি তা না। বাংলাদেশ ভিক্ষাবৃত্তির দেশ। এই দেশে ভিক্ষাবৃত্তিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এখানে ভিক্ষা করে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হবার কথা না। এখন অবশ্যি কঠিন বলে মনে হচ্ছে। খিদেয় অস্থির বোধ করছি।

ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে মারিয়াদের বাড়িতে উপস্থিত হলে তারা সকালের নাশতা অবশ্যই খাওয়াবে। ইংলিশ ব্রেকফাস্ট — প্রথমে আধা গ্লাস কমলার রস। খিদেটাকে চনমনে করার জন্যে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ কমলার রসের কোন তুলনা

নেই। তারপর কি? তারপর অনেক কিছু আছে। সব টেবিলে সাজানো। যা ইচ্ছা তুলে নাও।

১। **পাউরুটির স্লাইস**
(পাশেই মাখনের বাটিতে মাখন। মাখন-কাটা ছুরি। মারমালেডের বোতল। অনেকে পাউরুটির স্লাইসে পুরু করে মাখন দিয়ে, তার উপর হালকা মারমালেড ছড়িয়ে দেন।)

২। **ডিম সিদ্ধ**
(হাফ বয়েল্‌ড্‌। ডিম সিদ্ধের সঙ্গে আছে গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ। ডিম ভাঙতেই ভেতর থেকে গরম ভাপ উঠবে — হলদে কুসুম গড়িয়ে পড়তে শুরু করবে — তখন তার উপর ছিটিয়ে দিতে হবে গোলমরিচ ও লবণ।)

৩। **গোশত ভাজা**
(ইংরেজি নামটা যেন কি? সসেজ? ফ্রায়েড সসেজ? আগুন-গরম সসেজ। খাবার নিয়ম হল একটুকরা গোশত ভাজা, এক চুমুক ব্ল্যাক কফি . . . তাড়াহুড়া কিছু নেই। ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজ পড়া যেতে পারে। সব পড়ার দরকার নেই, শুধু হেড লাইন . . .)

আচ্ছা, এইসব কি? আমি কি পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি? আমি না একজন মহাপুরুষ টাইপ মানুষ? খাদ্যের মত অতি স্থূল একটা ব্যাপার আমাকে অভিভূত করে রাখবে, তা কি করে হয়?



'হিরোস ওয়েলকাম' বলে একটি বাক্য আছে। মহান বীর যুদ্ধ জয়ের পর দেশে ফিরলে যা হয় — আনন্দ-উল্লাস, আতশবাজি পোড়ানো, গণসঙ্গীত। থানায় পা দেয়ামাত্র হিরোস ওয়েলকাম বাক্যটি আমার মাথায় এল। আমাকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সেন্ট্রির সেপাই একটা বিকট চিৎকার দিল — "আরে হিমু ভাইয়া!" আমি গেলাম হকচকিয়ে। থানার সবাই ছুটে এলেন। সেকেন্ড অফিসার একগাল হেসে বললেন, "স্যার, কেমন আছেন?" ওসি সাহেব আমাকে হাত ধরে বসাতে বসাতে বললেন, ভাই সাহেব, আরাম করে বসুন তো। আপনি আমাদের যা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন। কাওরান বাজারে যেখানে আপনাকে নামিয়ে দিয়েছে সেখানে দু'বার জীপ পাঠিয়েছি আপনার খোঁজে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, ব্যাপার কি?

'ব্যাপারটা যে কি সে তো আপনি বলবেন। আপনি যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তা তো বুঝিনি। মানুষের কপালে তো লেখা থাকে না সে কে। লেখা থাকলে পুলিশের জন্যে ভাল হত। কপালের লেখা দেখে হাজতে ঢুকাতাম, লেখা দেখে চা-কফি খাইয়ে স্যালুট করে বাসায় পৌঁছে দিতাম।'

'ভাই, আমি অতি নগণ্য এক হিমু।'

'আপনি নগণ্য হলে আমাদের এই অবস্থা!'

'কি অবস্থা?'

'একেবারে বেড়াছেড়া অবস্থা। দাঁড়ান সব বলছি। ভাই সাহেব, চা খাবেন — ঐ আকবর, হিমু ভাইয়ারে চা দে। তারপর ভাইসাহেব শোনেন কি ব্যাপার। আপনাকে তো ছেড়ে দিলাম, তারপরই মারিয়া নামের একটি মেয়ে টেলিফোন করল — আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি যতই বলি ছেড়ে দিয়েছি ততই চেপে ধরে। আমার কথা বিশ্বাস করে না, রাগ করে টেলিফোন রেখে দিলাম, তারপর শুরু হল গজব।'

'কি গজব?'

'একের পর এক টেলিফোন আসা শুরু হল, ডিআইজি, এআইজি, সবশেষে আইজি সাহেব নিজে। আমি স্যারদের বললাম — আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। তাঁরা

বিশ্বাস করলেন। তারপর টেলিফোন করলেন হোম মিনিস্টার। রাত তখন তিনটা দশ। মন্ত্রীরা তো সহজে কিছু বোঝেন না। যতই বলি, স্যার, ওনাকে ছেড়ে দিয়েছি — মন্ত্রী বলেন, দেখি লাইনে দিন, কথা বলি। আরে, যাকে ছেড়ে দিয়েছি তাকে লাইনে দেব কিভাবে? আমি কি যাদুকর জুয়েল আইচ?'

উনি বললেন, হিমু সাহেবকে যেখান থেকে পারেন খুঁজে আনেন।

'আমার কলজে গেল শুকিয়ে। হার্টে ড্রপ বিট শুরু হল। এখন আপনাকে দেখে কলিজায় পানি এসেছে। হার্টও নরমাল হয়েছে। ভাইয়া, আপনি যে এমন তালেবর ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারিনি। নিজগুণে ক্ষমা করে দিন। পায়ের ধুলাও কিছু দিয়ে দেবেন, বোতলে ভরে থানার ফাইল ক্যাবিনেটে রেখে দেব। এখন হিমু ভাইয়া, আপনি টেলিফোনটা হাতে নিন। যাঁদের নাম বললাম এক এক করে তাঁদের সবাইকে টেলিফোন করে জানান যে আপনি আছেন। আপনার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়ে ওঁদের শান্ত করুন। ওনারা বড়ই অশান্ত।'

'এঁদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'আপনি এঁদের চেনেন না আর এঁরা আমার জান পানি করে দেবে, তা তো হবে না ভাইয়া। নাচতে নেমেছেন, এখন আর ঘোমটা দিতে পারবেন না। আপনি মারিয়াকে টেলিফোন করুন। তার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে অন্যদের টেলিফোনে ধরুন।'

আকবর চা নিয়ে এসেছে। ওসি সাহেব আকবরের কাছ থেকে চায়ের কাপ নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। আকবরের দিকে আগুন-চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হারামজাদা, এক কাপ চা আনতে এতক্ষণ লাগে?' বলেই আচমকা এক চড় বসালেন। আকবর উল্টে পড়ে গেল। আবার স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

ওসি সাহেব টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাম্বার বলুন আমি ডায়াল করে দিচ্ছি। ডায়াল করতে আপনার কষ্ট হবে। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না।

'নাম্বার হচ্ছে আট-আমি-তুমি-আমি-তুমি-আমরা। এর মানে ৮ ১২ ১২৩।'

'ভাই, আপনার কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছিও না। আপনি নিজেই টেলিফোন করুন। বুঝলেন হিমু ভাইয়া, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যতদিন পুলিশে চাকরি করব ততদিন হলুদ পাঞ্জাবি পরা কাউকে ধরব না। মার্ডার কেইসের আসামী হলেও না।'

মারিয়া জেগেই ছিল। আমি তাকে জানালাম যে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি ছাড়া পেয়েছি এবং ভাল আছি।

মারিয়া বলল, আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি কে বলল? আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না। অকারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মেয়ে আমি না। বাবা দুশ্চিন্তা

করছেন। আমার কাছ থেকে আপনার গ্রেফতারের কথা শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তারপর শুরু করলেন টেলিফোন।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কেমন আছেন?'

'ভাল আছেন। টেলিফোন রাখি?'

'তুই রেগে আছিস কেন?'

'আপনাকে অসংখ্যবার বলেছি — তুই তুই করবেন না।'

'আচ্ছা, করব না। তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?'

'হিমু ভাই, আপনি অকারণে কথা বলছেন?'

'তোমার বাবা কি জেগে আছেন?'

'হ্যাঁ, জেগে আছেন। বাবা রাতে ঘুমুতে পারেন না। আপনি কি বাবার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'না।'

'বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত, আপনি তাঁর সঙ্গে সামান্য কথা বলতেও আগ্রহী না?'

'মরিয়ম,. ব্যাপারটা হল কি . . .'

'মরিয়ম বলছেন কেন? আমার নাম কি মরিয়ম . . . ?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

'ভুল তো হয়েছেই। আপনি একের পর এক ভুল করবেন — তারপর সেই ভুলটা শুদ্ধ হিসেবে দেখাবার একবার চেষ্টা করবেন। সেটা কি ঠিক?'

'কি ভুল করলাম?'

'যখন আপনাকে আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হয়েছিল তখন আপনি ঠিক করলেন — আমাদের বাসায় আর আসবেন না। বাবা আপনাকে এত পছন্দ করেন — তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। আপনার কথা বলেন — কিন্তু আপনার খোঁজ নেই। যাতে আমরা আপনার খোঁজ না পাই তার জন্যে আগের ঠিকানা পর্যন্ত পাল্টে ফেললেন।'

'মারিয়া, তোমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঠিকানা পাল্টাইনি। আমার অভ্যাস হচ্ছে দু'দিন পর পর জায়গা বদল করা। মানুষ গাছের মত, এক জায়গায় কিছু দিন থাকলেই শিকড় গজিয়ে যায়। আমি চাই না আমার শিকড় গজাক।'

'হিমু ভাই, হাত জোড় করে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, দয়া করে আমার সঙ্গে ফিলসফি করার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমাদের বাসায় আসা বন্ধ করেছিলেন, কারণ আমি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল কম। পনেরো বছর। পনেরো বছরের একটি কিশোরী তো ভুল করবেই। মেয়েরা তাদের জীবনের সবচে বড় ভুলগুলি অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে করে, আমিও করেছি।'

'ভুল বলছ কেন? তখন যা করেছিলে হয়ত ঠিকই করেছিলে। এখন ভুল মনে হচ্ছে। আমি জানতাম একদিন তোমার এ রকম মনে হবে . . .'
'জানতেন বলেই আমার চিঠির জবাব দেননি?'
'মারিয়া, তোমাকে বলেছি — চিঠির পাঠোদ্ধার আমি করতে পারিনি।'
'আবার মিথ্যা বলছেন?'
'পুরোপুরি মিথ্যা না। পঞ্চাশ ভাগ মিথ্যা। আমি আবার একশ ভাগ মিথ্যা বলতে পারি না। সব সময় মিথ্যার সঙ্গে সত্যি মিশিয়ে দি।'
'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিথ্যা কতটুকু আর সত্যি কতটুকু?'
'আমি পাঠোদ্ধার করতে পারিনি এটা সত্যি, তবে বাদল পেরেছে।'
'বাদল কে?'
'আমার ফুপাতো ভাই। আমার মহাভক্ত। আমার শিষ্য বলা যেতে পারে।'
'আপনি আমার চিঠি দুনিয়ার সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছেন?'
'সবাই না, শুধু বাদলকে দিয়েছিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বের করে ফেলল — তখন আর চিঠিটা পড়তে আমার ইচ্ছা করল না। কাজেই অর্থ বের করার পরেও আমি চিঠি পড়িনি।'
'আপনি চিঠি পড়েননি?
'না।'
'কি লিখেছিলাম জানতে আগ্রহ হয়নি?'
'আগ্রহ চাপা দিয়েছি।'
'কেন?'
'কারণটা হল . . .'
'থাক, কারণ শুনতে চাই না।'
মারিয়া হঠাৎ করে বলল, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি টেলিফোন রাখলাম। ভাল কথা, আপনার ঠিকানা বলুন। লিখে নেই। আর শুনুন, মা আপনাকে হাত দেখাতে চান। একদিন এসে মা'র হাতটা দেখে দিন।
আমি ঠিকানা বললাম। সে টেলিফোন রাখল। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি হাসলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনার দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। ভাল কথা, আপনাদের হাজতে আলি আসগর বলে কি কেউ আছে? বেচারার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
ওসি সাহেব সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু ভাইয়াকে হাজতে নিয়ে যান। উনি নিজে দেখুন। আসগর-ফাসগর যাকেই পান নিয়ে বাড়ি চলে যান।
আসগর সাহেব হাজতে ছিলেন। মনে হল নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের গুঁতা খেয়েছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। আমি তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এলাম।

পুলিশের জীপ থাকলে এবারও হয়ত জীপে করে আমাদের পৌঁছাতো। জীপ ছিল না। সকাল হয়ে আসছে। পিকেটাররা বের হবে। আগামী দিনের হরতাল জম্পেশ করে করা হবে। পুলিশের ব্যস্ততা সীমাহীন।
আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আসগর সাহেব হাঁটতে পারছেন না। আমি বললাম, রোলারের গুঁতা খেয়েছেন? আসগর সাহেব কিছু বললেন না। বলবেন না, তাও জানি। কিছু মানুষ আছে অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে যায়, কিন্তু নিজের সমস্যা আড়াল করে রাখে।
'হিমু ভাই।'
'জ্বি।'
'একটু বসব।'
'শরীর খারাপ লাগছে?'
'হুঁ।'
আমি তাঁকে সাবধানে ফুটপাতের উপর বসালাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বমি করলেন। রক্তবমি।
'আসগর সাহেব।'
'জ্বি।'
'আপনার অবস্থা তো মনে হয় সুবিধার না।'
'জ্বি।'
'চলুন আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাসায় গিয়ে লাভ নেই।'
'নেবেন কি ভাবে? উঠে দাঁড়াতে পারছি না।'
'একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আসুন বসে থাকি। নাকি শোবেন?'
'জ্বি আচ্ছা।'
আমি তাঁকে ফুটপাতে শুইয়ে দিলাম। মাথার নীচে ইট জাতীয় কিছু দিতে পারলে ভাল হত। ইট দেখছি না।
'হিমু ভাই।'
'জ্বি।'
'রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষদের কষ্ট দিতে এত ভালবাসে কি জন্যে? তাঁরা রাজনীতি করেন — আমরা কষ্ট পাই। এর কারণ কি?'
'রাজনীতি হল রাজাদের ব্যাপার — বোধহয় এ জন্যেই। রাজনীতি বাদ দিয়ে তাঁরা যখন জননীতি করবেন তখন আর আমাদের কষ্ট হবে না।'
'এ রকম কি কখনো হবে?'
'বুঝতে পারছি না। হবার তো কথা। মেঘের আড়ালে সূর্য থাকে।'

'সূর্য কি আছে?'

'সূর্য নিশ্চয়ই আছে। মেঘ সরে গেলেই দেখা যাবে।'

'মেঘ যদি অনেক বেশি সময় থাকে তাহলে কিন্তু এক সময় সূর্য ডুবে যায়। তখন মেঘ কেটে গেলেও সূর্যকে আর পাওয়া যায় না।'

আমি শংকিত বোধ করছি। ভয়াবহ ধরনের অসুস্থ মানুষেরা হঠাৎ দার্শনিক হয়ে ওঠে। ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হয়। অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন ঘটিত সমস্যা দেখা দিতে থাকে। উচ্চস্তরের ফিলসফি আসলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন ঘাটতিজনিত সমস্যা। আসগর সাহেবকে দ্রুত হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। রিকশা, ভ্যানগাড়ি কিছুই দেখছি না।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল। মাটি-কাটা কুলি একজন পাওয়া গেল। সে কাঁধে করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

আসগর সাহেব মানুষের কাঁধে চড়তে লজ্জা পাচ্ছেন। আমি বললাম, লজ্জার কিছু নেই। হাসিমুখে কাঁধে চেপে বসুন। চিরকালই মানুষ মানুষের কাঁধে চেপেছে। একটা ঘোড়া আরেকটা ঘোড়াকে কাঁধে নিয়ে চলে না। মানুষ চলে। সৃষ্টির সেরা জীবদের কাণ্ডকারখানাও সেরা।



গল্প-উপন্যাসে পাখি-ডাকা ভোর বাক্যটা প্রায় পাওয়া যায়। যারা ভোরবেলা পাখির ডাক শোনেন না তাঁদের কাছে 'পাখি-ডাকা ভোরের' রোমান্টিক আবেদন আছে। লেখকরা কিন্তু পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন — তাঁরা পাখি-ডাকা ভোর বাক্যটায় পাখির নাম বলেন না। ভোরবেলা যে পাখি ডাকে তার নাম কাক। 'কাক-ডাকা ভোর' লিখলে ভোরবেলার দৃশ্যটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যেত।

কাকের কা কা শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। খুব একটা খারাপ লাগল তা না। কা কা শব্দ যত কর্কশই হোক, শব্দটা আসছে পাখির গলা থেকেই। প্রকৃতি অসুন্দর কিছু সৃষ্টি করে না — কাকের মধ্যেও সুন্দর কিছু নিশ্চয়ই আছে। সেই সুন্দরটা বের করতে হবে — এই ভাবতে ভাবতে বিছানা থেকে নামলাম। তারপরই মনে হল — এত ভোরে বিছানা থেকে শুধু শুধু কেন নামছি? আমার সামনে কোন পরীক্ষা নেই যে হাত-মুখ ধুয়ে বই নিয়ে বসতে হবে। ভোরে ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে ছুটতে হবে না। চলছে অসহযোগের ছুটি। শুধু একবার ঢাকা মেডিকেলে যেতে হবে। আসগর সাহেবের খোঁজ নিতে হবে। খোঁজ না নিলেও চলবে। আমার তো কিছু করার নেই। আমি কোন চিকিৎসক না। আমি অতি সাধারণ হিমু। কাজেই আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। চৈত্র মাসের শুরুর ভোরবেলাগুলিতে হিম হিম ভাব থাকে। হাত-পা গুটিয়ে পাতলা চাদরে শরীর ঢেকে রাখলে মন্দ লাগে না।

অনেকে ভোর হওয়া দেখার জন্যে রাত কাটার আগেই জেগে ওঠেন। তাঁদের ধারণা, রাত কেটে ভোর হওয়া একটা অসাধারণ দৃশ্য। সেই দৃশ্য না দেখলে মানবজন্ম বৃথা। তাঁদের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার কাছে মনে হয় সব দৃশ্যই অসাধারণ। এই যে পাতলা একটা কাঁথা গায়ে মাথা ঢেকে শুয়ে আছি এই দৃশ্যেরই কি তুলনা আছে? কাঁথার ছেঁড়া ফুটো দিয়ে আলো আসছে। একটা মশাও সেই ফুটো দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে। বেচারা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছে — কি করবে বুঝতে পারছে না। সূর্য উঠে যাবার পর মশাদের রক্ত খাবার নিয়ম নেই। সূর্য উঠে গেছে। বেচারার বুকে রক্তের তৃষ্ণা। চোখের সামনে খালি গায়ের এক লোক শুয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই তার গায়ের রক্ত খাওয়া যায় — কিন্তু দিনের আলোয় রক্ত খাওয়াটা কি ঠিক হবে? সে মহা চিন্তিত হয়ে হিমু নামক মানুষটার কানের কাছে ভন ভন করছে। মনে হচ্ছে অনুমতি প্রার্থনা করছে। মশাদের ভাষায় বলছে — স্যার, আপনার শরীর থেকে এক ফোঁটার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রক্ত কি খেতে

পারি? আপনারা মুমূর্ষু রোগীর জন্যে রক্ত দান করেন, ওদের প্রাণ রক্ষা করেন। আমাদের প্রাণও তো প্রাণ —। ক্ষুদ্র হলেও প্রাণ। সেই প্রাণ রক্ষা করতে সামান্য রক্ত দিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন স্যার? কবি বলেছেন — "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

এইসব দৃশ্যও কি অসাধারণ না? তারপরেও আমরা আলাদা করে কিছু মুহূর্ত চিহ্নিত করি। এদের নাম দেই অসাধারণ মুহূর্ত। সাংবাদিকরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেন — আপনার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কি? বিখ্যাত ব্যক্তিরা আবার ইনিয়ে বিনিয়ে স্মরণীয় ঘটনার কথা বলেন (বেশিরভাগই বানোয়াট)।

সমগ্র জীবনটাই কি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পড়ে না? এই যে মশাটা কানের কাছে ভন ভন করতে করতে উড়ছে, আবহ সংগীত হিসেবে ভেসে আসছে কাকদের কা কা — এই ঘটনাও কি স্মরণীয় না? আমি হাই তুলতে তুলতে মশাটাকে বললাম — খা ব্যাটা, রক্ত খা। আমি কিছু বলব না। ভরপেট রক্ত খেয়ে ঘুমুতে যা — আমাকেও ঘুমুতে দে।

মশার সঙ্গে কথোপকথন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কড়া নড়ল। সূর্য-ওঠা সকালে কে আসবে আমার কাছে? মশাটার কথা বলা এবং বোঝার ক্ষমতা থাকলে বলতাম — যা ব্যাটা, দেখে আয় কে এসেছে। দেখে এসে আমাকে কানে কানে বলে যা। যেহেতু মশাদের সেই ক্ষমতা নেই সেহেতু আমাকে উঠতে হল। দরজা খুলতে হল। দরজা ধরে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম মারিয়া। এই ভোরবেলায় কালো সানগ্লাসে তার চোখ ঢাকা। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। চকলেট রঙের সিল্কের শাড়িতে কালো রঙের ফুল ফুটে আছে। কানে পাথর বসানো দুল — খুব সম্ভব চুণী। লাল রঙ ঝিকমিক করে চলছে। এরকম রূপবতী একজন তরুণীর সামনে আমি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যে কোন সময় কাঁথা গা থেকে পিছলে নেমে আসবে বলে এক হাতে কাঁথা সামলাতে হচ্ছে, অন্য হাতে লুঙ্গি। তাড়াহুড়া করে বিছানা থেকে নেমেছি বলে লুঙ্গির গিঁট ভালমত দেয়া হয়নি। লুঙ্গি খুলে নিচে নেমে এলে ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আধুনিক ছোটগল্প। গল্পের শিরোনাম — নাঙ্গুবাবা ও রূপবতী মারিয়া।

আমি নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললাম, মরিয়ম, তোমার খবর কি? ভোরবেলায় চোখে সানগ্লাস! চোখ উঠেছে?

'না চোখ ওঠেনি। আপনার খবর কি?'

'খবর ভাল।'

'এত সকালে এলে কিভাবে? হেঁটে?'

'যতটা সকাল আপনি ভাবছেন এখন তত সকাল না। সাড়ে দশটা বাজে।'

'বল কি!'

'হ্যাঁ।'

'এসেছ কি করে? গাড়ি-টাড়ি তো চলছে না।'

'রিকশায় এসেছি।'

'গুড।'

'ভিখিরীদের এই কাঁথা কোথায় পেয়েছেন?'

'আমার স্থাবর সম্পত্তি বলতে এই কাঁথা, বিছানা এবং মশারি।'

'কাঁথা জড়িয়ে আছেন কেন?'

'খালি গা তো, এই জন্যে কাঁথা জড়িয়ে আছি।'

'আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?'

'না।'

'আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার জন্যে এসেছি।'

'বলে ফেল।'

'পরশু রাতে যখন টেলিফোনে কথা হল তখনই আমার বলা উচিত ছিল। বলতে পারিনি। বলতে না পারার যন্ত্রণায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি। এখন বলব। বলে চলে যাব।'

'চা খাবে? চা খাওয়াতে পারি।'

'এ রকম নোংরা জায়গায় বসে আমি চা খাব না।'

'জায়গাটা আমি বদলে ফেলতে পারি।'

'কিভাবে বদলাবেন?'

'চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চিন্তা করতে হবে — তুই বসে আছিস ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। শান্ত একটা নদী। তুই যে জায়গায় বসে আছিস সে জায়গাটা হচ্ছে বটগাছের একটা গুড়ি। নদীর ঠিক উপরে বটগাছ হয় না — তবু ধরা যাক, হয়েছে। গাছে পাখি ডাকছে।'

মারিয়া শীতল গলায় বলল, তুই তুই করছেন কেন?

'মনের ভুলে তুই তুই করছি। আর হবে না। তোর সঙ্গে আমার যখন পরিচয় তখন তুই তুই করতাম তো — তাই।'

'আপনি কখনোই আমার সঙ্গে তুই তুই করেননি। আপনার সঙ্গে আমার কখনো তেমন করে কথাও হয়নি। আপনি কথা বলতেন মা'র সঙ্গে, বাবার সঙ্গে। আমি শুনতাম।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা বলবেন না। আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।'

'স্মৃতিশক্তি খুব ভাল তা বলা কি ঠিক হচ্ছে? যা বলতে এসেছিস তা বলতে ভুলে গেছিস।'

'ভুলিনি, চলে যাবার আগ মুহূর্তে বলব।'

'তাহলে ধরে নিতে পারি তুই কিছুক্ষণ আছিস?'

'হ্যাঁ।'
'আমি তাহলে হাত-মুখ ধুয়ে আসি আর চট করে চা নিয়ে আসি। দু'জনে বেশ মজা করে ময়ূরাক্ষীর তীরে বসে চা খাওয়া হবে।'
'যান, চা নিয়ে আসুন।'
'দু' মিনিটের জন্যে তুই কি চোখ বন্ধ করবি?'
'কেন?'
'আমি কাঁথাটা ফেলে দিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিতাম?'
'আপনার সেই বিখ্যাত হলুদ পাঞ্জাবি?'
'হ্যাঁ।'
'চোখ বন্ধ করতে হবে না। রাস্তা-ঘাটে প্রচুর খালি গায়ের লোক আমি দেখি। এতে কিছু যায় আসে না। ভাল কথা, আপনি কি তুই তুই চালিয়ে যাবেন?'
'হ্যাঁ।'
আমি পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম, লুঙ্গি বদলে পায়জামা পরলাম। আমার তোষকের নীচে কুড়ি টাকার একটা নোট থাকার কথা। বদু'র চায়ের দোকান আগে বাকি দিত — এখন দিচ্ছে না। চা আনতে হলে নগদ পয়সা লাগবে। আমরা সম্ভবত অতি দ্রুত 'ফেল কড়ি মাখ তেলে'র জগতে প্রবেশ' করছি। কিছুদিন আগেও বেশিরভাগ দোকানে বাঁধানো ফ্রেমে লেখা থাকতো — "বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না"। সেই সব দোকানে বাকি চাওয়া হত। দোকানের মালিকরা লজ্জা পেতেন না। এখন সেই লেখাও নেই, বাকির সিস্টেমও নেই। তোষকের নীচে কিছু পাওয়া গেল না। বদুর কাছ থেকে চা আসার ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে গেল।
মরিয়ম খাটের কাছে গেল। খাটে বসার ইচ্ছা বোধহয় ছিল। খাটের নোংরা চাদর, তেল-চিটচিটে বালিশ মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি। চলে গেল ঘরের কোণে রাখা টেবিলে। সে বসল টেবিলে পা ঝুলিয়ে। আমি শংকিত বোধ করলাম। টেবিলটা নড়বড়ে — তিনটা মাত্র পা। চার নম্বর পায়ের অভাব মোচনের চেষ্টা হরা হয়েছে টেবিলটাকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে। মরিয়ম টেবিলে বসে যেভাবে নড়াচড়া করছে তাতে ব্যালেন্স গণ্ডগোল করে যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। মরিয়ম পা দোলাতে দোলাতে বলল, আপনার এই ঘর কখনো ঝাট দেয়া হয় না?
'একেবারেই যে হয় না তা না। মাঝে মাঝে হয়।'
'তোষকের নীচে কি খুঁজছেন?'
'টাকা। পাচ্ছি না। হাপিস হয়ে গেছে। তুই কি দশটা টাকা ধার দিবি?'
'না। আমি ধার দেই না। আপনার বিছানার উপর যে জিনিসটা ঝুলছে তার নাম কি মশারি?'
'হুঁ।'
'সারা মশারি জুড়েই তো বিশাল ফুটা — কি আশ্চর্য কাণ্ড!'

'তুই আমার মশারি দেখে রাগ করছিস — মশারা খুব আনন্দিত হয়। মশারি যখন খাটাই মশারা হেসে ফেলে।'
'মশাদের হাসি আপনি দেখেছেন?'
'না দেখলেও অনুমান করতে পারি। তুই কি চোখ থেকে কালো চশমাটা নামাবি? অসহ্য লাগছে।'
'অসহ্য লাগছে কেন?'
'আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমাদের একজন টিচার ছিলেন — সরোয়ার স্যার। ইংরেজি পড়াতেন। খুব ভাল পড়াতেন। হঠাৎ একদিন শুনি স্যার অন্ধ হয়ে গেছেন। মাস দু'-এক পর স্যার স্কুলে এলেন। তাঁর চোখে কালো সানগ্লাস। অন্ধ হবার পরও স্যার পড়াতেন। দপ্তরী হাত ধরে ধরে তাঁকে ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিত। চেয়ারে বসে বসে তিনি পড়াতেন। চোখে থাকতো সানগ্লাস। স্যারকে মনে হত পাথরের মূর্তি। এরপর থেকে সানগ্লাস পরা কাউকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'
মরিয়ম সানগ্লাস খুলে ফেলল। আমি বললাম, তোর চোখ অসম্ভব সুন্দর। কালো চশমায় এ রকম সুন্দর চোখ ঢেকে রাখা খুব অন্যায়। আর কখনো চোখে সানগ্লাস দিবি না।
'আমি রোদ সহ্য করতে পারি না। চোখ জ্বালা করে।'
'জ্বালা করলে করুক। তোর চোখ থাকবে খোলা, সুন্দর চোখ সবাই দেখবে। সৌন্দর্য সবার জন্যে।'
মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার বুকও খুব সুন্দর। তাই বলে সবাইকে বুক দেখিয়ে বেড়াব?
আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা বলে কি? এই সময়ের মেয়েরা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যত সহজে যত অবলীলায় মরিয়ম এই কথাগুলি বলল, আজ থেকে দশ বছর আগে কি কোন তরুণী এ জাতীয় কথা বলতে পারত?
মরিয়ম বলল, হিমু ভাই, আপনি মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন?
'কিছুটা ঘাবড়ে গেছি তো বটেই।'
'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি এরচে অনেক ভয়ংকর কথা বলি। আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না।'
'তুই এমন ভয়ংকর ভঙ্গিতে পা দুলাবি না। টেবিলের অবস্থা সুবিধার না।'
আমি বাথরুমের দিকে রওনা হলাম। আমাদের এই নিউ আইডিয়াল মেসে মোট আঠারো জন বোর্ডার — একটাই বাথরুম। সকালের দিকে বাথরুম খালি পাওয়া ঈদের আগে আন্তনগর ট্রেনের টিকেট পাওয়ার মত। খালি পেলেও সমস্যা — ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরপরই দরজায় টোকা পড়বে — 'ব্রাদার, একটু কুইক করবেন।'

আজ বাথরুম খালি ছিল। হাত-মুখ ধোয়া হল, দাড়ি শেভ করা হল না, দাঁত মাজা হল না। রেজার এবং ব্রাশ ঘর থেকে নিয়ে বের হওয়া হয়নি। পকেটে চিরুনি থাকলে ভাল হত। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে ভদ্রস্থ হওয়া যেত। বেঁটে মানুষরা লম্বা কাউকে দেখলে বুক টান করে লম্বা হবার চেষ্টা করে। ফিটফাট পোশাকের কাউকে দেখলে নিজেও একটু ফিটফাট হতে চায় — ব্যাপারটা এরকম।

মরিয়মের জরুরী কথা জানা গেল — সে এসেছে আমাকে হাত দেখাতে। হাত দেখার আমি কিছুই জানি না। যাঁরা দেখেন তাঁরাও জানেন না। মানুষের ভবিষ্যৎ বলার জন্যে হাত দেখা জানা জরুরী নয়। মন খুশি-করা জাতীয় কিছু কথা গুছিয়ে বলতে পারলেই হল। সব ভাল ভাল কথা বলতে হবে। দু'-একটা রেখা নিয়ে এমন ভাব করতে হবে যে, রেখার অর্থ ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। অন্তত একবার ভাল কোন চিহ্ন দেখে লাফিয়ে উঠতে হবে। বিস্মিত গলায় বলতে হবে — কি আশ্চর্য, হাতে দেখি ত্রিশূল চিহ্ন। এক লক্ষ হাত দেখলে একটা এমন চিহ্ন পাওয়া যায়।

মানুষ সহজে প্রতারিত হয় এরকম কথাগুলির একটি হচ্ছে — "আপনি বড়ই অভিমানী, নিজের কষ্ট প্রকাশ করেন না, লুকিয়ে রাখেন।"

যে সামান্য মাথাব্যথাতে অস্থির হয়ে বাড়ির সবাইকে জ্বালাতন করে সেও এই কথায় আবেগে অভিভূত হয়ে বলবে — ঠিক ধরেছেন। আমার মনের তীব্র কষ্টও আমার অতি নিকটজন জানে না। ভাই, আপনি হাত তো অসাধারণ দেখেন।

আমি মরিয়মের হাত ধরে ঝিম মেরে বসে আছি। এ রকম ভাব দেখাচ্ছি যেন গভীর সমুদ্রে পড়েছি — হাতের রেখার কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না। মরিয়ম বিরক্তির সঙ্গে বলল, কি হয়েছে?

আমি বললাম, হাত দেখা তো কোন সহজ বিদ্যা না। অতি জটিল। চিন্তা-ভাবনার সময়টা দিতে হবে না?

মরিয়ম বলল, আমার হেড লাইন মাউন্ট অব লুনার দিকে বেঁকে গেছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা ক্রস। এর মানে কি?

আমি বললাম — এর মানে অসাধারণ।

মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, অসাধারণ?

'অবশ্যই অসাধারণ। তোর মাথা খুব পরিষ্কার। চন্দ্রের শুভ প্রভাবে তুই প্রভাবিত। চন্দ্র তোকে আগলে রাখছে পাখির মত। মুরগি যেমন তার বাচ্চাকে আগলে রাখে, চন্দ্র তোকে অবিকল সেভাবে আগলে রাখছে। ক্রস যেটা আছে — সেটা আরো শুভ একটা ব্যাপার। ক্রস হচ্ছে — তারকা। তারকা চিহ্নের কারণে সর্ববিষয়ে সাফল্য।

মরিয়ম তার হাত টেনে নিয়ে মুখ কালো করে বলল, আপনি তো হাত দেখার কিছুই জানেন না। হেড লাইন যদি মাউন্ট অব লুনার দিকে বেঁকে যায়, এবং যদি সেখানে স্টার থাকে তাহলে ভয়াবহ ব্যাপার। এটা সুইসাইডের চিহ্ন।

'কে বলেছে?'

'কাউন্ট লুইস হ্যামন বলেছেন।'

'তিনি আবার কে?'

'তাঁর নিক নেম কিরো। কিরোর নামও শোনেননি — সমানে মানুষের হাত দেখে বেড়াচ্ছেন। এত ভাওতাবাজি শিখেছেন কোথায়?'

বদুমিয়ার অ্যাসিসটেন্ট চা নিয়ে ঢুকেছে। কোকের বোতল ভর্তি এক বোতল চা। সঙ্গে দু'টা খালি কাপ। সে বোতল এবং কাপ নামিয়ে চলে গেল। মরিয়ম শীতল গলায় বলল, এই নোংরা চা আমি মরে গেলেও খাব না। আপনি খান। আপনাকে হাতও দেখতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

'তুই চলে যাবি?'

'হ্যাঁ চলে যাব। আপনার এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। বক বক করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করলাম। আপনি প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড।'

মরিয়ম উঠে দাঁড়াল। চোখে সানগ্লাস পরল। বোঝাই যাচ্ছে সে আহত হয়েছে।

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'হাত দেখাবার জন্যে আমি কিন্তু আপনার কাছে আসিনি। হাত আমি নিজে খুব ভালই দেখতে পারি। আমি অন্য একটা কারণে এসেছিলাম। কারণটা জানতে চান?'

'চাই।'

'ঐ দিন আপনাকে দেখে শকের মত লাগল। হতভম্ব হয়ে ভেবেছি কি করে আপনার মত মানুষকে আমি আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটা লিখলাম। এত বড় ভুল কি করে করলাম?'

'ভুলটা কত বড় তা ভালমত জানার জন্যে আবার এসেছিস?'

'হ্যাঁ। আমার চিঠিটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই। থাক, মাথা চুলকাতে হবে না। আপনি কোন এক সময় বাবাকে গিয়ে দেখে আসবেন। তিনি আপনাকে খুব পছন্দ করেন সেটা তো আপনি জানেন? জানেন না?'

'জানি। যাব, একবার গিয়ে দেখে আসব। চল্ তোকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আপনাকে আসতে হবে না। আপনি না এলেই আমি খুশি হব। আপনি বরং কোকের বোতলের চা শেষ করে কাঁথা গায়ে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

মরিয়ম গট গট করে চলে গেল। আমি কোকের বোতলের চা সবটা শেষ করলাম। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। চায়ে আফিং-টাফিং দেয় কি-না কে জানে। শুনেছি ঢাকার অনেক চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে সামান্য আফিং মেশায়। এতে চায়ের বিক্রি ভাল হয়। মনে হয় বদুও তাই করে। পুরো এক বোতল চা খাওয়ায় ঝিমুনির মতো লাগছে। দ্বিতীয় দফা ঘুমের জন্যে আমি বিছানায় উঠে পড়লাম। বিছানায়

ওঠামাত্র হাই উঠল। হাই-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল — শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে — শরীর তাই জানান দিচ্ছে। আর অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে — আমার ঘুম পাচ্ছে। এই মুহূর্তে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

অনেকেই আছে একবার ঘুম চটে গেলে আর ঘুমুতে পারে না। আমার সেই সমস্যা নেই। যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারি। মহাপুরুষদের ইচ্ছা-মৃত্যুর ক্ষমতা থাকে, আমার আছে ইচ্ছা-ঘুমের ক্ষমতা। যে কোন সময় যে কোন পরিস্থিতিতে ইচ্ছে করলেই ঘুমিয়ে পড়া — এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ করার নয়। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি, আমার আরেকটা ক্ষমতা আছে — ইচ্ছা-স্বপ্নের ক্ষমতা। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখতে পারি। যেমন ধরা যাক সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে — বিছানায় গা এলিয়ে কল্পনায় সমুদ্রকে দেখতে হবে। কল্পনা করতে করতে ঘুম এসে যাবে। তখন আসবে স্বপ্নের সমুদ্র। তবে কল্পনার সমুদ্রের সঙ্গে স্বপ্নের সমুদ্রের আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য থাকবে।

সমুদ্র কল্পনা করতে করতে পাশ ফিরলাম। ঘুম আসি-আসি করছে। অনেকদিন স্বপ্নে সমুদ্র দেখা হয় না। আজ দেখা হবে ভেবে খানিকটা উৎফুল্লও বোধ করছি — আবার একটু ভয়-ভয়ও লাগছে। আমার ইচ্ছা-স্বপ্নগুলি কেন জানি শেষের দিকে খানিকটা ভয়ংকর হয়ে পড়ে। শুরু হয় বেশ সহজভাবেই — শেষ হয় ভয়ংকরভাবে। কে বলবে এর মানে কি? একজন কাউকে যদি পাওয়া যেত যে সব প্রশ্নের উত্তর জানে, তাহলে চমৎকার হত। ছুটে যাওয়া যেত তাঁর কাছে। এ রকম কেউ নেই — বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর আমার নিজের কাছে খুঁজি। নিজে যে প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না সেই প্রশ্নগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দেই। ডাস্টবিনের মরা বিড়াল, পচাগলা খাবার, মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সঙ্গে প্রশ্নগুলিও পড়ে থাকে। আমরা ভাবি প্রশ্নগুলিও এক সময় পচে যাবে — মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে নিয়ে যাবে। কে জানে নেয় কি-না।

আমি পাশ ফিরলাম। ঘুম আর স্বপ্ন দু'টাই একসঙ্গে এসেছে।

আমার স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমি স্বপ্ন দেখার সময় বুঝতে পারি যে স্বপ্ন দেখছি। এবং মাঝে মধ্যে স্বপ্ন বদলে ফেলতেও পারি। যেমন ধরা যাক, খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখছি — অনেক উঁচু থেকে সাঁই সাঁই করে নিচে পড়ে যাচ্ছি। শরীর কাঁপছে। তখন হুট করে স্বপ্নটা বদলে অন্য স্বপ্ন করে ফেলি। স্বপ্নের মধ্যে ব্যাখ্যাও করতে পারি — স্বপ্নটা কেন দেখছি।

আজ দেখলাম মরিয়মের বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে। (তাঁকে দেখা খুব স্বাভাবিক। একটুক্ষণ আগেই মরিয়মের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল।) মরিয়ম তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ তিনি অন্ধ। এটা কেন দেখলাম বুঝতে পারছি না। আসাদুল্লাহ সাহেব অন্ধ না। আসাদুল্লাহ সাহেবকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হল।

তখন তাঁর মুখটা হয়ে গেল পত্রলেখক আসগর সাহেবের মত (এটা কেন হল বোঝা গেল না। স্বপ্ন অতি দ্রুত জটিল হয়ে যায়। খুব জটিল হলে স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যায় — তখন আর তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন জটিল হতে শুরু করেছে।)

মরিয়ম তার বাবার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল (যদিও ভদ্রলোককে এখন দেখাচ্ছে পুরোপুরি আসগর সাহেবের মত)। মরিয়ম বলল, আমার বাবা পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। যার যা প্রশ্ন আছে, করুন। আমাদের হাতে সময় নেই। একেবারেই সময় নেই। যে কোন সময় রমনা থানার ওসি চলে আসবেন। তিনি আসার আগেই প্রশ্ন করতে হবে। কুইক, কুইক। কে প্রথম প্রশ্ন করবেন? কে, কে?

আমি বুঝতে পারছি। স্বপ্ন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সে এখন চলবে তার নিজস্ব অদ্ভুত নিয়মে। আমি তারপরেও হাল ছেড়ে দিলাম না, হাত উঠালাম।

মরিয়ম বলল, আপনি প্রশ্ন করবেন?

'জ্বি।'

'আপনার নাম এবং পরিচয় দিন।'

'আমার নাম হিমু। আমি একজন মহাপুরুষ।'

'আপনার প্রশ্ন কি বলুন। আমার বাবা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

'মহাপুরুষ হবার প্রথম শর্ত কি?'

আসাদুল্লাহ সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মহাপুরুষ হবার শর্ত বলা শুরু করেছেন। তাঁর গলার স্বর ভারি এবং গম্ভীর। খানিকটা প্রতিধ্বনি হচ্ছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতর থেকে কথা বলছেন —

একেক যুগের মহাপুরুষরা একেক রকম হন। মহাপুরুষদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। হজরত মুসা আলাইহেস সালামের সময় যুগটা ছিল যাদুবিদ্যার। বড় বড় যাদুকর তাঁদের অদ্ভুত সব যাদু দেখিয়ে বেড়াতেন। কাজেই সেই যুগে মহাপুরুষ পাঠানো হল যাদুকর হিসেবে। হজরত মুসার ছিল অসাধারণ যাদু-ক্ষমতা। তাঁর হাতের লাঠি ফেলে দিলে সাপ হয়ে যেত। সে সাপ অন্য যাদুকরদের সাপ খেয়ে ফেলত।

হজরত ইউসুফের সময়টা ছিল সৌন্দর্যের। তখন রূপের খুব কদর ছিল। হজরত ইউসুফকে পাঠানো হল অসম্ভব রূপবান মানুষ হিসেবে।

হজরত ঈসা আলায়হেস সালামের যুগ ছিল চিকিৎসার। নানান ধরনের অষুধপত্র তখন বের হল। কাজেই হজরত ঈসাকে পাঠানো হল অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে। তিনি অন্ধত্ব সারাতে পারতেন। বোবাকে কথা বলার ক্ষমতা দিতে পারতেন।

বর্তমান যুগ হচ্ছে ভণ্ডামির। কাজেই এই যুগে মহাপুরুষকে অবশ্যই ভণ্ড হতে হবে।

হাততালি পড়ছে। হাততালির শব্দে মাথা ধরে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি স্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পেতে। এই স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগছে না। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙছে না।



ফুপা টেলিগ্রামের ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন —

Emergency come sharp.

চিঠি নিয়ে এসেছে তাঁর অফিসের পিওন। সে যাচ্ছে না, চিঠি হাতে দিয়ে চোখ-মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার?

সে শুকনা গলায় বলল, বখশিশ।

'বখশিশ কিসের? তুমি ভয়ংকর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছ। তোমাকে যে ধরে মার লাগাচ্ছি না এই যথেষ্ট। ভাল খবর আনলে বখশিশ পেতে। খুবই খারাপ সংবাদ।'

'রিকশা ভাড়া দেন। যামু ক্যামনে?'

'পায়দল চলে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে দৃশ্য দেখতে দেখতে যাবে। তাছাড়া রিকশা ভাড়া দিলেও লাভ হবে না — আজ রিকশা চলছে না। ভয়াবহ হরতাল।'

'রিকশা টুকটাক চলতাছে।'

'টুকটাক যে সব রিকশা চলছে তাতে চললে বোমা খাবে। জেনে-শুনে কাউকে কি বোমা খাওয়ানো যায়? তুমি কোন্ দল কর?

'কোন দল করি না।'

'বল কি! আওয়ামী লীগ, বিএনপি কোনটা না?'

'জ্বে না।'

'ভোট কাকে দাও?'

'ভোট দেই না।'

'তুমি তাহলে দেখি নির্দলীয় সরকারের লোক। এ রকম তো সচরাচর পাওয়া যায় না। নাম কি তোমার?'

'মোহাম্মদ আবদুল গফুর।'

'গফুর সাহেব, রিকশা ভাড়া তোমাকে দিচ্ছি। আমার কাছে একটা পয়সা নেই। ধার করে এনে দিতে হবে। ভাড়া কত?'

'কুড়ি টাকা।'

'বল কি! এখান থেকে মতিঝিল কুড়ি টাকা?'

'হরতালের টাইমে রিকশা ভাড়া ডাবল।'

'তা তো বটেই। দাঁড়াও, আমি টাকা জোগাড় করে আনি। তবে একটা কথা বলি

— কুড়ি টাকা পকেটে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাবে। রিকশায় উঠলেই বোমা খাবে।'

গফুর রাগি রাগি চোখে তাকাল। আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললাম, আমি আসলে একজন মহাপুরুষ। ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাই। এই জন্যে সাবধান করে দিচ্ছি।

'জ্বে আচ্ছা।'

মোহাম্মদ আবদুল গফুর মুখ বেজার করে বসে রইল। আমি মেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করলাম। মেস ম্যানেজারের মুখ বেজার হয়ে গেল। মোহাম্মদ আবদুল গফুরের মুখে হাসি ফুটল। এখন এই মেস ম্যানেজার তার বেজার ভাব অন্যজনের উপর ঢেলে দেবে। সে আবার আরেকজনকে দেবে। বেজার ভাব চেইন রিঅ্যাকশনের মত চলতে থাকবে। আনন্দ চেইন রিঅ্যাকশনে প্রবাহিত করা যায় না — নিরানন্দ করা যায়।

ফুপার চিঠি হাতে ঝিম ধরে খানিকক্ষণ বসে কাটালাম। ঘটনা কি আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাদল কি দেশে? ছুটি কাটাতে এসে বড় ধরনের কোন ঝামেলা বাঁধিয়েছে। এইটুকু অনুমান করা যায়। বাদল উদ্ভট কিছু করছে, কেউ তাকে সামলাতে পারছে না। ওঝা হিসেবে আমার ডাক পড়েছে। আমি মন্ত্র পড়লেই কাজ দেবে, কারণ বাদলের কাছে আমি হচ্ছি ভয়াবহ ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহাপুরুষ। আমি যদি সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলি, এই ব্যাটা সূর্য, দীর্ঘদিন তো পূর্ব দিকে উঠলি — এবার একটু পশ্চিম দিকে ওঠ্। পূর্ব দিকে তোর উদয় দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে — তাহলে সূর্য তৎক্ষণাৎ আমার কথা শুনে পশ্চিম দিকে উঠবে।

বাদল শুধু যে বুদ্ধিমান ছেলে তা না, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। মারিয়ার সাংকেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করতে তার তিন মিনিট লেগেছে। এই ছেলে আমার সম্পর্কে এমন ধারণা করে কি করে আমি জানি না। আমি যদি হিমু-ধর্ম নামে নতুন কোন ধর্মপ্রচার শুরু করি তাহলে অবশ্যই সে হবে আমার প্রথম শিষ্য। এবং এই ধর্মপ্রচারের জন্যে সে হবে প্রথম শহীদ। বাদল ছাড়াও কিছু শিষ্য পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। আসগর সাহেব শিষ্য হবেন। ধর্মে মুগ্ধ হয়ে হবেন তা না — ভদ্রলোক শিষ্য হবেন আমাকে খুশি করার জন্যে। কোন রকম কারণ ছাড়া তিনি আমার প্রতি অন্ধ একটা টান অনুভব করেন। আসগর সাহেব ছাড়া আর কেউ কি শিষ্য হবে? কানা কুদ্দুস কি হবে? সম্ভাবনা আছে। সেও আমাকে পছন্দ করে। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানুষ মারতে কেমন লাগে কুদ্দুস?

সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, ভাল-মন্দ কোন রকম লাগে না।

'বটি দিয়ে লাউ কাটতে যেমন লাগে তেমন 'কচ' একটা শব্দ?'

'ঠিক সেই রকম না, ভাইজান। মরণের সময় মানুষ চিল্লা-ফাল্লা কইরা বড়

ত্যক্ত করে। লাউ তো আর চিল্লা-ফাল্লা করে না।'

'তা তো বটেই। চিল্লা-ফাল্লার জন্যে খারাপ লাগে?'

'জ্বি না, খারাপ লাগে না। চিল্লা-ফাল্লাটা করবই। মৃত্যু বলে কথা। মৃত্যু কোন সহজ ব্যাপার না। ঠিক বললাম না?'

'অবশ্যই ঠিক।'

কুদ্দুস মিয়া উদাস ভঙ্গিতে বলল, আফনেরে কেউ ডিসটার্ব করলে নাম-ঠিকানা দিয়েন।

'নাম-ঠিকানা দিলে কি করবে? 'কচ' ট্রিটমেন্ট? কচ করে লাউ-এর মত কেটে ফেলবে?'

'সেইটা আমার বিষয়, আমি দেখব। আফনের কাম নাম-ঠিকানা দেওন।'

'আচ্ছা, মনে থাকল।'

'আরেকটা ঠিকানা দিতেছি — ধরেন কোন বিপদে পড়ছেন। পুলিশ আফনেরে খুঁজতেছে। আশ্রয় দরকার। দানাপানি দরকার — এই ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া বলবেন, আমার নাম হিমু। ব্যবস্থা হবে। আমি এডভান্স আফনের কথা বইল্যা রাখছি। বলছি হিমু ভাই আমার ওস্তাদ।'

' "আমি হিমু" এই কথাটা কাকে বলতে হবে?'

'দরজায় তিনটা টোকা দিয়া একটু থামবেন আবার তিনটা টোকা দেবেন, আবার থামবেন, আবার তিন টোকা . . . এই হইল সিগনাল — তখন যে দরজা খুলব তারে বলবেন।'

'দরজা কে খুলবে?'

'আমার মেয়ে-মানুষ দরজা খুলব। নাম জয়গুন। চেহারা বড় বেশি বিউটি। মনে হবে সিনেমার নায়িকা।'

'খুব মোটাগাটা?'

'গিয়া একবার দেইখ্যা আইসেন — এমন সুন্দর, দেখলে মনে হয় গলা টিপ্যা মাইরা ফেলি।'

'গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে কেন?'

'এইসব মেয়েছেলে সবের সাথেই রং-ঢং করে। আফনে একটা বিশিষ্ট ভদ্রলোক — বিপদে পইড়া তার এইখানে আশ্রয় নিছেন। তা হারামি মেয়েছেলে করব কি জানেন? আফনের সাথে দুনিয়ার গফ করব। কাপড়-চোপড় থাকব আউলা। ইচ্ছা কইরা আউলা। ব্লাউজ যেটা পরব তার দুইটা বোতাম নাই। বোতাম ছিল — ইচ্ছা কইরা ছিড়ছে। এমন হারামি মেয়ে।'

নতুন হিমু-ধর্মে কুদ্দুসের সেই হারামি মেয়েটা কি ঢুকবে? তার সঙ্গে এখনো পরিচয় হয়নি। একদিন পরিচয় করে আসতে হবে। একটা ধর্ম শুরু করলে সেখানে রূপবতী মহিলা (যাদের ব্লাউজের দু'টা বোতাম ইচ্ছা করে ছেঁড়া) না থাকলে অন্যরা

আকৃষ্ট হবে না।

মারিয়াকে কি পাওয়া যাবে?

মনে হয় না। মারিয়া টাইপ মেয়েদের কখনোই আসলে পাওয়া যায় না। আবার ভুল করলাম — কোন মেয়েকেই আসলে পাওয়া যায় না। তারা অভিনয় করে সঙ্গে আছে এই পর্যন্তই। অভিনয় শুধু যে অতি প্রিয়জনদের সঙ্গে করে তা না, নিজের সঙ্গেও করে। নিজেরা সেটা বুঝতে পারে না।

আমি ফুপার বাসার দিকে রওনা হলাম এমন সময়ে যেন দুপুরে ঠিক খাবার সময় উপস্থিত হতে পারি। দু'মাস খরচ দেয়া হয়নি বলে মেসে মিল বন্ধ হয়ে গেছে। দু'বেলা খাবার জন্যে নিত্য নতুন ফন্দি-ফিকির বের করতে হচ্ছে। দুপুরের খাবারটা ফুপার ওখানে সেরে রাতে যাব মেডিকেল কলেজে আসগর সাহেবকে দেখতে। আসগর সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি কিছুই খেতে পারেন না। তাঁকে দেয়া হাসপাতালের খাবারটা খেয়ে নিলে রাত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। খুব বেশি সমস্যা হলে কানা কুদ্দুসের মেয়েছেলে দু'টা বোতামবিহীন নায়িকা জয়গুন তো আছেই।

আজ বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। ফুপাদের বাসায় গিয়ে দেখি সবাই টেবিলে খেতে বসেছে। সবার সঙ্গে ফুপাও আছেন। তাঁর মুখ সব সময় গম্ভীর থাকে। আজ আরো গম্ভীর। তাঁর চিঠি পেয়েই আমি এসেছি, তারপরেও তিনি এমন ভঙ্গি করলেন যেন আমাকে দেখে তাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে।

শুধু বাদল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। বিকট চিৎকার দিল, আরে হিমু দা, তুমি! তুমি কোত্থেকে?

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে আকাশ থেকে নেমে এসেছে। খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিস কেন? বোস।

বাদল বসল না। ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে রইল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম — তারপর, সব খবর ভাল? মনে হচ্ছে তুই ছুটিতে দেশে এসে আটকা পড়েছিস?

'হ্যাঁ, হিমু দা।'

'সবাই এমন চুপচাপ কেন?'

কেউ কিছু বলল না, শুধু বাদল বলল, এত দিন পর তোমাকে দেখছি — কি যে ভাল লাগছে! তুমি হাত ধুয়ে খেতে বস। মা, হিমু দাকে প্লেট দাও। আর একটা ডিম ভেজে দাও। হিমু দা ডিমভাজা খুব পছন্দ করে। ফার্মের ডিম না মা, দেশি মুরগির ডিম।

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, খামাকা কথা বলবি না বাদল। কথা বলে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিস। ভাত খা। ঘরে পাঁচ-ছ' পদ তরকারি, এর মধ্যে আবার ডিম ভাজতে হবে? কাজের লোক নেই, কিচ্ছু নেই।

বাদল বলল, আমি ভেজে নিয়ে আসছি। হিমু দা, তুমি হাত ধুয় টেবিলে বস।

আমি হাত ধুয়ে টেবিলে বসলাম। বাদল তার মা-বাবার অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে সত্যি সত্যি ডিম ভাজতে গেল।

কাপে ডিম ফেটছে। চামচের শব্দ আসছে।

আমি টেবিলে বসতে বসতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের সমস্যাটা কি? আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছেন, বাদলের জন্যেই তো দিয়েছেন। কি করছে সে? চিকিৎসা করতে হলে রোগটা ভালমত জানা দরকার।

ফুপা বললেন, হারামজাদা দেশদরদী হয়েছে। অসহযোগের কারণে দেশ ধ্বংস হচ্ছে এই চিন্তায় হারামজাদার মাথা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। সে অনেক চিন্তাভাবনা করে সমস্যা থেকে বাঁচার বুদ্ধি বের করেছে।

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, এটা তো ভাল। দেশের সব চিন্তাশীল মানুষই এই সময় দেশ ঠিক করার পদ্ধতি নিয়ে ভাবছেন। মানব বন্ধন-ফন্ধন কি সব যেন করছেন। হাত ধরাধরি করে শুকনা মুখে দাঁড়িয়ে থাকা। বাদলের পদ্ধতিটা কি?

ফুপা বললেন, গাধার পদ্ধতি তো গাধার মতই।

'কি রকম সেটা? রাজপথে চার পায়ে হামাগুড়ি দেবে? হামাগুড়ি দিতে দিতে সচিবালয়ের দিকে যাবে?'

'সেটা করলেও তো ভাল ছিল — গাধাটা ঠিক করেছে জিরো পয়েন্টে গিয়ে রাজনীতিবিদদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্যে সে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ। বেকুবটা দু'শ তেত্রিশ টাকা দিয়ে একটিন কেরোসিন কিনে এনেছে। তার ঘরে সাজানো আছে। তুই এখন এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যা।'

'কেরোসিন কেনা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেছে।'

'দেখি কি করা যায়।'

আমি খাওয়া শুরু করলাম। বাদল ডিম ভেজে হাসিমুখে উপস্থিত হল। আমি বললাম, কি রে, তুই নাকি গায়ে আগুন দিচ্ছিস?

বাদল উজ্জ্বল মুখে বলল, হ্যাঁ, হিমু দা। আইডিয়াটা পেয়েছি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে। আত্মাহুতি। পত্রপত্রিকায় নিউজটা ছাপা হলে রাজনীতিবিদরা একটা ধাক্কা খাবেন। দুই নেত্রীই বুঝবেন — পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। তাঁরা তখন আলোচনায় বসবেন।

ফুপা তিক্ত গলায় বললেন, দুই নেত্রীর বোঝার হলে আগেই বুঝত। এই পর্যন্ত তো মানুষ কম মরেনি। তুই তো প্রথম না!

আমি বললাম, এইখানে আপনি একটা ভুল করছেন ফুপা। বাদল প্রথম তো

বটেই। এম্নিতেই মানুষ মরছে পুলিশের গুলিতে, বোমাবাজিতে কিন্তু আত্মাহুতি তো এখনো হয়নি। বাদলই হল প্রথম। পত্রিকায় ঠিকমত জানিয়ে দিলে এরা ফটোগ্রাফার নিয়ে থাকবে। সিএনএন-কে খবর দিলে ক্যামেরা চলে আসবে। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা সবাই নিউজ কাভার করবে। এতে একটা চাপ তৈরি হবে তো বটেই।

ফুপা-ফুপু দু'জনেই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁদের হতভম্ব দৃষ্টি উপক্ষো করে বাদলকে বললাম, বাদল, তোর আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।

'সত্যি পছন্দ হয়েছে হিমু দা?'

'অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। দেশমাতৃকার জন্যে জীবনদান সহজ ব্যাপার তো না। তবে শোন, কেরোসিন ঢালার সঙ্গে সঙ্গে আগুন দিবি। কেরোসিন হচ্ছে ভলাটাইল উদ্বায়ী। সঙ্গে সঙ্গে আগুন না দিলে উড়ে চলে যাবে — আগুন আর ধরবে না। আর একটা ব্যাপার বলা দরকার — শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আগুন ধরালে লাভ হবে না। লোকজন থাবা-টাবা দিয়ে নিভিয়ে ফেলবে। তুই আলুপোড়া হনুমান হয়ে যাবি কিন্তু মরবি না। তোকে যা করতে হবে তা হল কেরোসিন ঢালার আগে দু'টা গেঞ্জি, দু'টা শার্ট পরতে হবে।'

বাদল কৃতজ্ঞ গলায় বলল, থ্যাংক য়্যু হিমু দা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তো বিরাট ঝামেলায় পড়তাম।

'এখন বল্ আত্মাহুতির তারিখ কবে ঠিক করেছিস?'

'আমি কিছু ঠিক করিনি। তুমি বলে দাও। তুমি যেদিন বলবে সেদিন।'

'দেরি করা ঠিক হবে না। তুই দেরি করলি আর দেশ অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে গেল, আর্মি এসে ক্ষমতা নিয়ে নিল — এটা কি ঠিক হবে?'

'না, ঠিক হবে না। হিমু দা, আগামী কাল বা পরশু?'

ফুপা-ফুপু দু'জনেই খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফুপু যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন সেই দৃষ্টির নিক নেম হল অগ্নিদৃষ্টি। দু'শ তেত্রিশ টাকা দামের কেরোসিন টিনের সবটুকু আগুন এখন তাঁর দুই চোখে। আমি তাঁর অগ্নিদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গম্ভীর গলায় বাদলকে বললাম, যা করার দু'-একদিনের মধ্যেই করতে হবে। হাতে আমাদের সময় অল্প। এর মধ্যেই তোর নিজের কাজ সব গুছিয়ে ফেলতে হবে।

'আমার আবার কাজ কি?'

'আত্মীয়স্বজন সবার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া। পা ছুঁয়ে সালাম করা। সবার দোয়া নেয়া। এসএসসি পরীক্ষার আগে ছেলেমেয়েরা যা করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোয়া ভিক্ষা।'

'এইসব ফরমালিটিজ আমার ভাল লাগে না হিমু দা।'

'ভাল না লাগলেও করতে হবে। আত্মীয়স্বজনদের একটা সাধ-আহ্লাদ তো আছে। তোর চিন্তার কারণ নেই। আমি সঙ্গে যাব।'

'তুমি সঙ্গে গেলে যাব।'

আমি ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের জন্যে অ্যাডভান্স কুলখানি করলে কেমন হয় ফুপা? সবাইকে খবর দিয়ে একটা কুলখানি করে ফেললাম। ওনলি ওয়ান আইটেম — কাচ্চি বিরিয়ানি। বাদল নিজে উপস্থিত থেকে সবাইকে খাওয়াল। নিজের কুলখানি নিজে খাওয়াও একটা আনন্দের ব্যাপার।

ফুপা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ভয়ংকর কিছু করে ফেলবেন কি-না কে জানে। কই মাছের ঝোলের বাটি আমার দিকে ছুঁড়ে ফেললে বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি বাটি নিজের দিকে টেনে নিলাম।

বিকেলে বাদলকে নিয়েই বের হলাম। দু'-একজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতালে আসগর সাহেবকে দেখতে যাব। বাদলকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বড় কিছু করতে পারার আনন্দে সে ঝলমল করছে।

'বাদল!'

'জ্বি।'

'তোর কাছে টাকা আছে?'

'একশ বিয়াল্লিশ টাকা আছে।'

'তাহলে চল আমাকে শিক কাবাব আর নানরুটি কিনে দে।'

'কেন?'

'একজনকে শিক কাবাব আর নানরুটির দাওয়াত দিয়েছি। টাকার অভাবে কিনতে পারছি না।'

'কাকে দাওয়াত দিয়েছ?'

'একটা কুকুরকে। কাওরান বাজারে থাকে। পা খোঁড়া। আমার সঙ্গে খুব খাতির।'

অন্য কেউ হলে আমার কথায় বিস্মিত হত। বাদল হল না। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এদের সঙ্গে আমার ভাব তো থাকবেই। আমি তো সাধারণ কেউ না।

'হিমু দা!'

'বল।'

'তোমার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। তুমি এটা নিয়ে নিও। মরে গেলে তুমি পাবে না।'

'আমার কি আছে তোর কাছে?'

'ঐ যে পাঁচ বছর আগে একটা সাংকেতিক চিঠি দিয়েছিলে। মারিয়া নামের একটা মেয়ে তোমাকে লিখেছিল।'

'ঐ চিঠি এখনো রেখে দিয়েছিস?'

'কি আশ্চর্য! তোমার একটা জিনিস তুমি আমার কাছে দিয়েছ আর আমি সেটা ফেলে দেব? তুমি আমাকে কি ভাব?'

'সাংকেতিক চিঠি তুই এত চট করে ধরে ফেললি কি করে বল তো? এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না।'

বাদল আনন্দিত গলায় বলল, খুব সোজা। আমি তোমাকে বললাম, যে চিঠি দিয়েছে তার নাম কি? তুমি বললে — মারিয়া। কাজেই চিঠির শেষে তার নাম থাকবে। চিঠির শেষে লেখা ছিল NBSJB. (অর্থাৎ M-এর জায়গায় মেয়েটা লিখেছে N, A-র জায়গায় লিখেছে B, যেখানে R হবার কথা সেখানে লিখেছে S) মেয়েটা করেছে কি জান — যে অক্ষরটা লেখার কথা সেটা না লিখে তার পরেরটা লিখেছে। এখন বুঝতে পারছ?

'পারছি।'

'চিঠিতে সে কি লিখেছিল তুমি জানতে চাওনি। বলব কি লিখেছে?'

'না। বাদল, একটা কথা শোন, তোর এত বুদ্ধি কিন্তু তুই একটা সহজ জিনিস বুঝতে পারছিস না।'

'সহজ জিনিসটা কি?'

'আজ থাক, আরেকদিন বলব।'

শিক কাবাব এবং নানরুটি কিনে এনেছি। কুকুরটাকে পাওয়া গেছে। সে আমাকে দেখেই ছুটে এসেছে। বাদলের দিকে প্রথমে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম — তোর খাবার এনেছি, তুই আরাম করে খা। এ হচ্ছে বাদল। অসাধারণ বুদ্ধিমান একটা ছেলে।

কুকুরটা বাদলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে দু'বার ঘেউ ঘেউ করে খেতে শুরু করল।

আমি বললাম, মাংসটা আগে খা। নানরুটি খেয়ে পেট ভরালে পরে আর মাংস খেতে পারবি না।

কুকুরটা নানরুটি ফেলে মাংস খাওয়া শুরু করল। বাদল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, ও কি তোমার কথা বোঝে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমার ধারণা নিম্নশ্রেণীর পশুপাখি মানুষের কথা বোঝে। অতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী মানুষই শুধু একে অন্যের কথা বোঝে না। বেগম খালেদা জিয়া কি বলছেন তা শেখ হাসিনা বুঝতে পারছেন না। আবার শেখ হাসিনা কি বলছেন তা বেগম খালেদা জিয়া বুঝতে পারছেন না। আমরা দেশের মানুষ কি বলছি সেটা আবার তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁরা কি বলছেন তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার না।

বাদল বলল, কেন?

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এই প্রশ্নের জবাব আমি জানি না। আসাদুল্লাহ সাহেব হয়ত জানেন।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কে?'

'যে মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখেছিল তার বাবা। আসাদুল্লাহ সাহেব পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন।'

কুকুরটা খেয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একবার খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির ভঙ্গিতে লেজ নাড়ল। যেন বলল — এত খাবার তোমাকে কে আনতে বলেছে? আমি সামান্য পথের নেড়ি কুকুর। আমাকে এতটা মমতা দেখানো কি ঠিক হচ্ছে? আমাদের পশু জগতের নিয়ম খুব কঠিন। ভালবাসা ফেরত দিতে হয়। মানুষ হয়ে তোমরা বেঁচে গেছ। তোমাদের ভালবাসা ফেরত দিতে হয় না।

আসগর সাহেবের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল না। তাঁকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। চলে আসছি, দরজার কাছের বেড থেকে একজন ক্ষীণ স্বরে ডাকল —ভাই সাহেব!

আমি ফিরলাম।

'আমারে চিনছেন ভাই সাহেব?'

'না।'

'আমি মোহম্মদ আব্দুল গফুর। আপনের কাছে চিঠি নিয়ে গেছিলাম। কুড়ি টাকা বখশিশ দিলেন।'

'খবর কি গফুর সাহেব?'

'খবর ভাল না ভাই সাহেব। বোমা খাইছি। রিকশা কইরা ফিরতেছিলাম। বোমা মারছে।'

'রিকশায় উঠতে নিষেধ করেছিলাম . . . '

'কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।'

'তা তো বটেই।'

'ঠ্যাং একটা কাইট্যা বাদ দিছে ভাই সাহেব।'

'একটা তো আছে। সেটাই কম কি? নাই মামার চেয়ে কানা মামা।'

'ভাই সাহেব, আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন ভাই সাহেব।'

'দেখি সময় পেলে করব। একেবারেই সময় পাচ্ছি না। হাঁটাহাটি খুব বেশি হচ্ছে। গফুর সাহেব, যাই?'

গফুর তাকিয়ে আছে। গফুরের বিছানায় যে মহিলা বসে আছেন তিনি বোধহয় গফুরের কন্যা। অসুস্থ বাবার পাশে কন্যার বসে থাকার দৃশ্যের চেয়ে মধুর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম — "মা যাই?"

মেয়েটি চমকে উঠল। আমি তাকে মা ডাকব এটা বোধহয় সে ভাবেনি।



মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বলাকা সিনেমা হলের সামনের পুরানো বইয়ের দোকানে। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রলোক পুরানো বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে চামড়ার বাঁধানো মোটা একটা বই। তিনি খুবই অসহায় ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাচ্ছেন। যেন জনতার ভেতর কাউকে খুঁজছেন। ভদ্রলোকের পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। ফটোসেনসিটিভ গ্লাস বলেই দুপুরের কড়া রোদে সানগ্লাসের মত কাল হয়ে ভদ্রলোকের চোখ ঢেকে দিয়েছে। আমি ভদ্রলোকের দিকে কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হতভম্ব হবার প্রধান কারণ, এমন সুপুরুষ আমি অনেকদিন দেখিনি। সুন্দর পুরুষদের কোন প্রতিযোগিতা নেই। থাকলে বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই এই ভদ্রলোককে পাঠানো যেত। চন্দ্রের কলংকের মত যাবতীয় সৌন্দর্যে খুঁত থাকে — আমি ভদ্রলোকের খুঁতটা কি বের করার জন্যে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে চমকে দিয়ে বললাম, কেমন আছেন?

অপরিচিত কেউ কেমন আছেন বললে আমরা জবাব দেই না। হয় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকি, কিংবা বলি, আপনাকে চিনতে পারছি না। এই ভদ্রলোক তা করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বললেন, জ্বি ভাল।

কাছে এসেও ভদ্রলোকের চেহারায় খুঁত ধরতে পারা গেল না। পঞ্চাশের মত বয়স। মাথাভর্তি চুল। চুলে পাক ধরেছে — মাথার আধাআধি চুল পাকা। এই পাকা চুলেই তাঁকে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে — কুচকুচে কাল হলে তাঁকে মানাতো না।

অসম্ভব রূপবতীদের বেলাতেও আমি এই ব্যাপারটা দেখেছি। তারা যখন যেভাবে থাকে — সেভাবেই তাদের ভাল লাগে। কপালে টিপ পরলে মনে হয় — আহ্, টিপটা কি সুন্দর লাগছে! টিপ না থাকলে মনে হয় — ভাগ্যিস, এই মেয়ে অন্য মেয়েগুলির মত কপালে টিপ দেয়নি। টিপ দিলে তাকে একেবারেই মানাতো না।

আমার ধারণা হল — ভদ্রলোকের চোখে হয়ত কোন সমস্যা আছে। হয়ত চোখ ট্যারা, কিংবা একটা চোখ নষ্ট। সেখানে পাথরের চোখ লাগানো। ফটোসেনসিটিভ সানগ্লাস চোখ থেকে না খোলা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। কাজেই আমাকে

ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু সময় থাকতে হবে। এই সময়ের ভেতর নিশ্চয়ই তাঁর চোখে ধুলাবালি পড়বে। চোখ পরিষ্কার করার জন্যে চশমা খুলবেন। যদি দেখি ভদ্রলোকের চোখও সম্রাট অশোক-পুত্র কুনালের চোখের মত অপূর্ব তাহলে আমার অনেকদিনের একটা আশা পূর্ণ হবে। আমি অনেকদিন থেকেই নিখুঁত রূপবান পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিখুঁত রূপবতীর দেখা পেয়েছি —রূপবানের দেখা এখনো পাইনি।

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিচিত মানুষের মত হাসলাম। তিনিও হাসলেন — তবে ব্যাকুল ভঙ্গিতে চারদিক তাকানো দূর হল না। আমি বললাম, স্যার, কোন সমস্যা হয়েছে?

তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, একটা সমস্যা অবশ্যি হয়েছে। ভাল একটা পুরানো বই পেয়েছি — Holder-এর Interpretation of Conscience. অনেকদিন বইটা খুঁজছিলাম, হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

আমি বললাম, বইটা কিনতে পারছেন না? টাকা শর্ট পড়েছে?

তিনি বললেন, জ্বি। কি করে বুঝলেন?

'ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে। আমার কাছে একশ' একুশ টাকা আছে — এতে কি হবে?'

'একশ' টাকা হলেই হবে।'

আমি একশ' টাকার নোট বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক খুব সহজভাবে নিলেন। অপরিচিত একজন মানুষ তাঁকে একশ' টাকা দিচ্ছে এই ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। ভদ্রলোক বই খুলে ভেতরের পাতায় আরেকবার চোখ বুলালেন — মনে হচ্ছে দেখে নিলেন মলাটে যে নাম লেখা ভেতরেও সেই নাম কি-না।

বই বগলে নিয়ে ভদ্রলোক এগুচ্ছেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তাঁর চোখ ভালমত না দেখে বিদেয় হওয়া যায় না। ভদ্রলোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আপনার নাম কি?

আমি বললাম, আমার নাম হিমালয়।

ভদ্রলোক বললেন, সুন্দর নাম — হিমালয়। বললেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। হিমালয় নাম শুনে সবাই সামান্য হলেও কৌতূহল নিয়ে আমাকে দেখে, ইনি তাও দেখছেন না। যেন হিমালয় নামের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।

আমরা নিউ মার্কেটের কার পার্কিং এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি শাদা রঙের বড় একটা গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভেতরে যাব কেন?

তিনি আমার চেয়েও বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার বাড়িতে চলুন, আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। তারপর আমার ড্রাইভার আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে পৌঁছে দেবে।

'অসম্ভব। আমার এখন অনেক কাজ।'

'বেশ, আপনার ঠিকানা বলুন। আমি টাকা পৌঁছে দেব।

'আমার কোন ঠিকানা নেই।'

'সে কি!'

'স্যার, আপনি বরং আপনার টেলিফোন নাম্বার দিন। আমি টেলিফোন করে একদিন আপনাদের বাসায় চলে যাব।'

'কার্ড দিচ্ছি, কার্ডে ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সবই আছে।'

'কার্ড না দেওয়াই ভাল। আমার পাঞ্জাবির কোন পকেট নেই। কার্ড হাতে নিয়ে ঘুরব, কিছুক্ষণ পর হাত থেকে ফেলে দেব। এরচে টেলিফোন নাম্বার বলুন, আমি মুখস্থ করে রেখে দি। আমার স্মৃতিশক্তি ভাল। একবার যা মুখস্থ করি তা ভুলি না।'

উনি টেলিফোন নাম্বার বললেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে বসলেন। তখনো তাঁর হাতে বইটি ধরা। মনে হচ্ছে বই হাতে নিয়েই গাড়ি চালাবেন। আমি বললাম, স্যার, দয়া করে এক সেকেন্ডের জন্যে আপনি কি চোখ থেকে চশমাটা খুলবেন?

'কেন?'

'ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটাব। অনেকক্ষণ থেকে আমার মনে হচ্ছিল আপনার একটা চোখ পাথরের।'

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এরকম মনে হবার কারণ কি? বলতে বলতে তিনি চোখ থেকে চশমা খুললেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর চোখ দেখলাম।

পৃথিবীতে সবচে সুন্দর চোখ নিয়ে চারজন মানুষ জন্মেছিলেন — মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা, ট্রয় নগরীর হেলেন, অশোকের পুত্র কুনাল এবং ইংরেজ কবি শেলী। আমার মনে হল — এই চারটি নামের সঙ্গে আরেকটি নাম যুক্ত করা যায়। ভদ্রলোকের কি নাম? আমি জানি না — ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। তাঁর টেলিফোন নাম্বারও ইতিমধ্যে ভুলে গেছি। তাতে ক্ষতি নেই — প্রকৃতি তাঁকে কম করে হলেও আরো চারবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। এইসব ব্যাপারে প্রকৃতি খুব উদার — পছন্দের সব মানুষকে প্রকৃতি কমপক্ষে পাঁচবার মুখোমুখি করে দেয়। মুখোমুখি করে মজা দেখে।

কাজেই আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগের কোন চেষ্টা আর করলাম না। আমি থাকি আমার মত — উনি থাকেন ওনার মত। আমি ঠিক করে রেখেছি — একদিন নিশ্চয়ই আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। তখন তাঁর সম্পর্কে জানা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মানুষটা ইন্টারেস্টিং। বই-প্রেমিক। হাতে বইটা পাবার পর আশপাশের সবকিছু ভুলে গেছেন। আমাকে সাধারণ ভদ্রতার ধন্যবাদও দেননি। আমি নিশ্চিত, আবার যখন দেখা হবে তখন দেবেন।

পরের বছর চৈত্র মাসের কথা (আমার জীবনের বড় বড় ঘটনা চৈত্র মাসে ঘটে।

কে বলবে রহস্যটা কি?) বেলা একটার মত বাজে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠে গেছে। অনেকক্ষণ হেঁটেছি বলে শরীর ঘামে ভিজে গেছে। পাঞ্জাবির এমন অবস্থা যে দু'হাতে চিপে উঠোনের দড়িতে শুকোতে দেয়া যায়। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। চোখের সামনে ভাসছে বড় মাপের একটা গ্লাস। গ্লাস ভর্তি পানি। তার উপর বরফের কুচি। কাঁচের পানির জগ হাতে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাস শেষ হওয়ামাত্র সে গ্লাস ভর্তি করে দেবে। জগ হাতে যে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু হাত দেখা যাচ্ছে — ধবধবে ফর্সা হাত। হাত ভর্তি লাল আর সবুজ কাঁচের চুড়ি। জগে করে পানি ঢালার সময় চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ উঠছে।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। চৈত্র মাসের দুপুরে ঢাকার রাজপথে পানির জগ হাতে চুড়িপরা কোন হাত থাকে না। আমি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, কোনদিন যদি প্রচুর টাকা হয় তাহলে চৈত্র মাসে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় জলসত্র খুলে দেব। সেখানে হাসিখুশি তরুণীরা পথচারীদের বরফ-শীতল পানি খাওয়াবে। ট্যাপের পানি না — ফুটন্ত পানি। পানিবাহিত জীবাণু যে পানিকে দূষিত করেনি সেই পানি। তরুণীদের গায়ে থাকবে আকাশী রঙ-এর শাড়ি। হাত ভর্তি লাল-সবুজ চুড়ি। চুড়ির লাল রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ঠোটে থাকবে আগুন-রঙা লিপস্টিক। তাদের চোখ কেমন হবে? তাদের চোখ এমন হবে যেন চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় —

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

প্রচণ্ড রোদের কারণেই বোধহয় মরীচিকা দেখার মত ব্যাপার ঘটল। আমি চোখের সামনে জলসত্রের মেয়েগুলিকে দেখতে পেলাম। একজন না, চার-পাঁচ জন। সবার হাতেই পানির জগ। হাত ভর্তি লাল-সবুজ চুড়ি। আর তখন আমার পেছনে একটা গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে মাথা বের করে জলসত্রের তরুণীদের একজন বলল, এই যে শুনুন। কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম কি হিমালয়?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'গাড়িতে উঠে আসুন। আমার নাম — মারিয়া।'

মেয়েটার বয়স তের-চৌদ্দ, কিংবা হয়ত আরো কম। বাচ্চা মেয়েরা হঠাৎ শাড়ি পরলে অন্য এক ধরনের সৌন্দর্য তাদের জড়িয়ে ধরে। এই মেয়েটির বেলায়ও তাই হয়েছে। মেয়েটি জলসত্রের মেয়েদের নিয়মমত আকাশী রঙের শাড়ি পরেছে। শাড়ি-পরা মেয়েদের কখনো তুমি বলতে নেই, তবু আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, কেমন আছ মারিয়া?

'জ্বি ভাল আছি।'

'তোমার হাতে লাল-সবুজ চুড়ি নেই কেন?'

মারিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। কিছু বলল না। আমি মেয়েটিকে চিনতে পারছি না। তাতে কিছু যায় আসে না।

মারিয়া বলল, আপনি কি অসুস্থ?

'না।'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। আপনি তো আমাকে চেনেন না — আমি কে জানতে চাচ্ছেন না কেন?'

'তুমি কে?'

'আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের মেয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

'আসাদুল্লাহ সাহেব কে তাও তো আপনি জানেন না।'

'না। উনি কে?'

'উনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে আপনি একবার একশ' টাকা ধার দিয়েছিলেন। মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'যে ভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় এখনো মনে পড়েনি। আপনি বাবাকে বলেছিলেন — তাঁর একটা চোখ পাথরের — এখন মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমরা কি এখন তাঁর কাছে যাচ্ছি? তাঁকে ঋণমুক্ত করার পরিকল্পনা?'

'না — তিনি দেশে নেই। বছরে মাত্র তিনমাস তিনি দেশে থাকেন। আপনার সঙ্গে দেখা হবার দু'মাস পরই তিনি চলে যান। এই দু'মাস আপনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলে তিনি খুব আপসেট ছিলেন। তিনি চলে যাবার আগে আপনার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে বলে গিয়েছিলেন যদি আপনাকে আমি বের করতে পারি তাহলে দারুণ একটা উপহার পাব। তারপর থেকে আমি পথে বের হলেই হলুদ পাঞ্জাবি পরা কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করি — আপনার নাম কি হিমালয়? ভাল কথা, আপনি আসলেই হিমালয় তো?'

'হুঁ — আমিই হিমালয়।'

'প্রমাণ দিতে পারেন?'

'পারি — আপনার বাবা যে বইটা কিনেছিলেন — তার নাম — "Interpretation of Conscience".'

'বাবা বলেছিলেন — আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ। আমার কাছে অবশ্যি তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'গুলশানের দিকে যাচ্ছি।'

গাড়ির ভেতরে এসি দেয়া — শরীর শীতল হয়ে আসছে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি জেগে থাকতে। ঘুম আনার জন্যে মানুষ ভেড়ার পাল গোনে। ঘুম না আসার জন্যে কিছু কি গোনার আছে? ভয়ংকর কোন প্রাণী গুনতে শুরু করলে ঘুম কেটে যাবার কথা। আমি মাকড়সা গুনতে শুরু করলাম।

একটা মাকড়সা, দু'টা মাকড়সা, তিনটা — চারটা, পাঁচটা। সর্বনাশ! পঞ্চমটা আবার ব্লাক উইডো মাকড়সা — কামড়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এত গোনাগুনি করেও লাভ হল না। মারিয়াদের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন আমি গভীর ঘুমে অচেতন। মারিয়া এবং তাদের ড্রাইভার দু'জন মিলে ডাকাডাকি করেও আমার ঘুম ভাঙাতে পারছে না।

মারিয়াদের পরিবারের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। মারিয়ার বয়স তখন পনেরো। সেদিনই সে প্রথম শাড়ি পরে। শাড়ির রঙ বলেছি কি? ও হ্যাঁ, আগে একবার বলেছি। আচ্ছা আবারো বলি, শাড়ির রঙ জলসত্রের মেয়েদের শাড়ির মত আকাশী নীল।

ঘুম ভেঙে দেখি চোখের সামনে হুলস্থুল ধরনের বাড়ি। প্রথম দর্শনে মনে হল বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। বুকে একটা ছোটখাট ধাক্কার মত লাগল। পুরো বাড়ি বোগেনভিলিয়ার গাঢ় লাল রঙে ঢাকা। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় ফুলের রঙকে আগুন বলে মনে হচ্ছিল।

মারিয়া বলল, বাড়ির নাম মনে করে রাখুন — চিত্রলেখা। চিত্রলেখা হচ্ছে আকাশের একটা তারার নাম।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

'আজ বাড়িতে কেউ নেই। মা গেছেন রাজশাহী।'

আমি আবারও বললাম, ও আচ্ছা।

'আপনি কি টাকাটা নিয়ে চলে যাবেন, না একটু বসবেন?'

'টাকা নিয়ে চলে যাব।'

'বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না?'

'না।'

'তাহলে এখানে দাঁড়ান।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা আগ্রহ করেই আমাকে এতদূর এনেছে কিন্তু আমাকে বাড়িতে ঢুকানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমি তাতে তেমন অবাক হলাম না। আমি লক্ষ্য করেছি বেশিরভাগ মানুষই আমাকে বাড়িতে ঢোকাতে চায় না। দরজার ওপাশে রেখে আলাপ করে বিদায় করে দিতে চায়।। রাস্তায় রাস্তায় দীর্ঘদিন হাঁটাহাটির ফলে আমার চেহারায় হয়ত রাস্তা-ভাব চলে এসেছে। রাস্তা-

ভাবের লোকজনদের কেউ ঘরে ঢোকাতে চায় না। রাস্তা-ভাবের লোক রাস্তাতেই ভাল। কবিতা আছে না —

বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

আমি সম্ভবত রাস্তাতেই সুন্দর।

'হিমালয় সাহেব!'

আমি তাকালাম। বাড়ির ভেতর থেকে মারিয়া ইন্সটিমেটিক ক্যামেরা হাতে বের হয়েছে। বের হতে অনেক সময় নিয়েছে, কারণ সে শাড়ি বদলেছে। এখন পরেছে স্কার্ট। স্কার্ট পরায় একটা লাভ হয়েছে। মেয়েটা যে অসম্ভব রূপবতী তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। শাড়িতে যেমন অপূর্ব লাগছিল স্কার্টেও তেমন লাগছে। দীর্ঘ সময় গেটের বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট মেয়েটাকে দেখে একটু যেন কমল।

'আপনি সূর্যকে সামনে রেখে একটু দাঁড়ান। মুখের উপর সানলাইট পড়ুক। আপনার ছবি তুলব। বাবাকে ছবির একটা কপি পাঠাতে হবে। ছবি দেখলে বাবা বুঝবেন যে, আমি আসল লোকই পেয়েছিলাম।'

'হাসব?'

'হ্যাঁ, হাসতে পারেন।'

'দাঁত বের করে হাসব? না ঠোঁট টিপে?'

'যে ভাবে হাসতে ভাল লাগে সে ভাবেই হাসুন। আর এই নিন টাকা।'

মারিয়া একশ টাকার দু'টা নোট এগিয়ে দিল। দু'টাই চকচকে নোট। বড়লোকদের সবই সুন্দর। আমি অল্প যে ক'জন দারুণ বড়লোক দেখেছি তাদের কারো কাছেই কখনো ময়লা নোট দেখিনি। ময়লা নোটগুলি এরা কি ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে ইস্ত্রি করে ফেলে? না-কি ডাস্টবিনে ফেলে দেয়?

'আমি আপনার বাবাকে একশ' টাকা দিয়েছিলাম।'

'বাবা বলে দিয়েছেন যদি আপনার দেখা পাই তাহলে যেন দু'শ টাকা দেই। কারণ — গ্রন্থ সাহেব বই-এ গুরু নানক বলেছেন —

দু গুনা দত্তার
চৌগুনা জুজ্বার।

দু'গুণ নিলে চারগুণ ফেরত দিতে হয়। বাবা সামনের মাসের ১৫ তারিখের পর আসবেন। আপনি তখন এলে বাবা খুব খুশি হবেন। আর বাবার সঙ্গে কথা বললে আপনার নিজেরও ভাল লাগবে।'

'আমার ভাল লাগবে সেটা কি করে বলছেন?'

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বাবার সঙ্গে যে পাঁচ মিনিট কথা বলে সে বার বার

ফিরে আসে।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা বলা কি আপনার মুদ্রা দোষ? একটু পর পর আপনি ও আচ্ছা বলছেন।'

'কিছু বলার পাচ্ছি না বলে "ও আচ্ছা" বলছি।'

'বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসবেন তো?'

'আসব।'

'আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে — যে প্রশ্নের জবাব আপনি জানেন না — সেই প্রশ্ন বাবার জন্যে নিয়ে আসতে পারেন। আমার ধারণা, আমার বাবা এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যিনি সব প্রশ্নের জবাব জানেন।'

আমি যথাসম্ভব বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বললাম — 'ও আচ্ছা'। মারিয়া বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাড়ির দারোয়ান গেট বন্ধ করে মোটা মোটা দুই তালা লাগিয়ে দিয়ে জেলের সেন্ট্রির মত তালা টেনে টেনে পরীক্ষা করতে লাগল। আমি হাতের মুঠোয় দু'টা চকচকে নোট নিয়ে চৈত্রের ভয়াবহ রোদে রাস্তায় নামলাম। মারিয়া একবারও বলল না — কোথায় যাবেন বলুন, গাড়ি আপনাকে পৌছে দেবে। বড়লোকদের ঠাণ্ডা গাড়ি মানুষের চরিত্র খারাপ করে দেয় — একবার চড়লে শুধুই চড়তে ইচ্ছা করে। আমি রাস্তায় হাঁটা মানুষ, অল্প কিছু সময় মারিয়াদের গাড়িতে চড়েছি, এতেই হেঁটে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে না।

আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হল আষাঢ় মাসে। বৃষ্টিতে ভিজে জবজবা হয়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছি। দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। ভাগ্যক্রমে মারিয়া এসে পড়ল। বড়লোকরা বোধহয় কিছুতেই বিস্মিত হয় না। কাকভেজা অবস্থায় আমাকে দেখেও একবারও জিজ্ঞেস করল না — ব্যাপার কি? সহজ ভঙ্গিতে সে আমাকে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে। বিশাল একটা ঘরে ভদ্রলোক খালি গায়ে বিছানায় বসে আছেন। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসা। তাঁর চোখ একটা খোলা বইয়ের দিকে। দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। আমরা দু'জন যে ঢুকলাম তিনি বুঝতেও পারলেন না। মারিয়া বলল, বাবা, একটু তাকাবে?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ তাকাব। বলার পরেও তাকালেন না। যে পাতাটা পড়ছিলেন সে পাতাটা পড়া শেষ করে বই উল্টে দিয়ে তারপর তাকালেন। তাকিয়ে হেসে ফেললেন। আমি চমকে গেলাম। মানুষের হাসি এত সুন্দর হয়! তৎক্ষণাৎ মনে হল — ভাগ্যিস, মেয়ে হয়ে জন্মাইনি! মেয়ে হয়ে জন্মালে এই ঘর থেকে বের হওয়া অসম্ভব হত।

'হিমালয় সাহেব না?'

জ্বি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি ভাল।'

'বোস। খাটের উপর বোস।'

'আমি কিন্তু স্যার ভিজে জবজবা।'

'কোন সমস্যা নেই। বোস। মাথা মুছবে?'

'জ্বি না স্যার। বৃষ্টির পানি আমি গায়ে শুকাই। তোয়ালে দিয়ে বৃষ্টির পানি মুছলে বৃষ্টির অপমান হয়।'

আমি খাটে বসলাম। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করলেন।

'তুমি কেমন আছ হিমালয়?'

'জ্বি ভাল।'

'ঐ দিন তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে এসেছিলাম — ধন্যবাদ পর্যন্ত দেইনি। আসলে মাথার মধ্যে সব সময় ছিল কখন বইটা পড়ব। জগতের চারপাশে তখন কি ঘটছিল তা আমার মাথায় ছিল না। ভাল কোন বই হাতে পেলে আমার এ রকম হয়।'

'বইটা কি ভাল ছিল?'

'আমি যতটা ভাল আসা করেছিলাম তারচে ভাল ছিল। এ জাতীয় বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না। পথে-ঘাটে পাওয়া যায়। আমি একবার পুরানো খবরের কাগজ কেনে এ রকম ফেরিওয়ালার ঝুড়ি থেকে একটা বই জোগাড় করেছিলাম। বইটার নাম 'Dawn of Intelligence'. এইটিন নাইনটি টু-তে প্রকাশিত বই — অথর হচ্ছেন ম্যাক মাস্টার। রয়েল সোসাইটির ফেলো। চামড়া দিয়ে মানুষ বই বাঁধিয়ে রাখে — ঐ বইটা ছিল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মত।

মারিয়া বলল, বইয়ের কচকচানি শুনতে ভাল লাগছে না বাবা — আমি যাচ্ছি। তোমাদের চা বা কফি কিছু লাগলে বল, আমি পাঠিয়ে দেব।

আসাদুল্লাহ সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের চা দাও। আর শোন, হিমালয়, তুমি আমাদের সঙ্গে দুপুরে খাবে। তোমার কি আপত্তি আছে?

'জ্বি না।'

'তোমাকে কি এক সেট শুকনো কাপড় দেব?'

'লাগবে না স্যার। শুকিয়ে যাবে।'

'তোমাকে দেখে এত ভাল লাগছে কেন বুঝতে পারছি না। মারিয়া, তুই বল তো এই ছেলেটাকে দেখে আমার এত ভাল লাগছে কেন?'

'তোমার ভাল লাগছে কারণ তুমি ধরে নিয়েছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। তাকে ধন্যবাদ দিতে পারবে না। সারাজীবন ঋণী হয়ে থাকবে। তুমি ঋণ শোধ করতে পেরেছ, এই জন্যেই ভাল লাগছে।'

'ভেরি গুড — যতই দিন যাচ্ছে তোর বুদ্ধি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে।'

মারিয়া চা আনতে গেল। আমি আসাদুল্লাহ সাহেবকে বললাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আমি আসলে আপনাকে দেখতে আসিনি, প্রশ্নটা করতে এসেছি।

আসাদুল্লাহ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কি প্রশ্ন?

'এই জীবজগতে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী কি আছে যে আত্মহত্যা করতে পারে?'

'আছে। লেমিং বলে এক ধরনের প্রাণী আছে। ইঁদুর গোত্রীয়। স্ত্রী-লেমিংদের বছরে দু'টা বাচ্চা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রতি চার বছর পর পর দু'টার বদলে এদের বাচ্চা হয় দশটা করে। তখন ভয়ংকর সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব। এরা তখন করে কি — দল বেঁধে সমুদ্রের দিকে হাঁটা শুরু করে। এক সময় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। মিনিট দশেক মনের আনন্দে সমুদ্রের পানিতে সাঁতরায়। তারপর সবাই দল বেঁধে সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করে। মাস স্যুইসাইড।'

'বলেন কি!'

'নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে মাস স্যুইসাইডের ব্যাপারটা আছে। সীল মাছ করে, নীল তিমিরা করে, হাতি করে। আবার এককভাবে আত্মহত্যার ব্যাপারও আছে। একক আত্মহত্যার ব্যাপারটা দেখা যায় প্রধানত কুকুরের মধ্যে। প্রভুর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে এরা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে আত্মহত্যা করে। পশুদের আত্মহত্যার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছ কেন?'

'জানতে চাচ্ছি, কারণ — আপনার কন্যার ধারণা আপনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। সত্যি জানেন কি-না পরীক্ষা করলাম।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আবারও হাসছেন। আমার আবারও মনে হল, মানুষ এত সুন্দর করে হাসে কি ভাবে?

'মারিয়ার এরকম ধারণা অবশ্যি আছে, যদিও তার মা'র ধারণা, আমি পৃথিবীর কোন প্রশ্নেরই জবাব জানি না। ভাল কথা, হিমালয় নামটা ডাকার জন্যে একটু বড় হয়ে গেছে — হিমু ডাকলে কি রাগ করবে?'

'জ্বি না।'

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'ব্যাপারটা কি তোমাকে বলি — আমার হল জাহাজের নাবিকের চাকরি। সিঙ্গাপুরের গোল্ডেন হেড শিপিং করপোরেশনের সঙ্গে আছি। মাসের পর মাস থাকতে হয় সমুদ্রে। প্রচুর অবসর। আমার আছে বই পড়ার নেশা — ক্রমাগত পড়ি। স্মৃতিশক্তি ভাল, যা পড়ি মনে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চট করে জবাব দিতে পারি।'

'এনসাইক্লোপিডিয়া হিউমেনিকা?'

'হা হা হা। তুমি তো মজা করে কথা বল। মোটেই এনসাইক্লোপিডিয়া না। আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দু'বার পড়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া মানুষ কেনে সাজিয়ে রাখার জন্যে, পড়ার জন্যে না। আমার হাতে ছিল প্রচুর সময় — সময়টা কাজে লাগিয়েছি। পড়েছি।'

'পড়তে আপনার ভাল লাগে?'

'শুধু ভাল লাগে না, অসাধারণ ভাল লাগে। প্রায়ই কি ভাবি জান? প্রায়ই ভাবি, মৃত্যুর পর আমাকে যদি বেহেশতে পাঠানো হয় তখন কি হবে? সেখানে কি লাইব্রেরি আছে? নানান ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটে দেখেছি। স্বর্গে লাইব্রেরি আছে এ রকম কথা কোন ধর্মগ্রন্থে পাইনি। সুন্দরী হুরদের কথা আছে, খাদ্য-পানীয়ের কথা আছে, ফলমূলের কথা আছে, বাট নো লাইব্রেরি।'

'বেহেশতে আপনি নিজের ভুবন নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে পারবেন। আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার হাতের কাছেই থাকবে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির মত প্রকাণ্ড লাইব্রেরি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, নিজের বেহেশত নিজের মত করা গেলে আমার বেহেশত কি রকম হবে তোমাকে বলি — সুন্দর একটা বিছানা থাকবে, বিছানায় বেশ কয়েকটা বালিশ। চারপাশে আলমিরা ভর্তি বই, একদম হাতের কাছে, যেন বিছানা থেকে না নেমেই বই নিতে পারি। কলিংবেল থাকবে — বেল টিপলেই চা আসবে।

'গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে না?'

'ভাল কথা মনে করেছ। অবশ্যই গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে। সফট স্টেরিও মিউজিক সারাক্ষণ হবে। মিউজিক পছন্দ না হলে আপনাআপনি অন্য মিউজিক বাজা শুরু হবে। হাত দিয়ে বোতাম টিপে ক্যাসেট বদলাতে হবে না।'

'সারাক্ষণ ঘরে বন্দি থাকতে ভাল লাগবে?'

'বন্দি বলছ কেন? বই খোলা মানে নতুন একটা জগৎ খুলে দেয়া।'

'তারপরেও আপনার হয়ত আকাশ দেখতে ইচ্ছা করবে।'

'এটাও মন্দ বলনি। হ্যাঁ থাকবে, বিশাল একটা জানালা আমার ঘরে থাকবে। তবে জানালায় মোটা পর্দা দেয়া থাকবে। যখন আকাশ দেখতে ইচ্ছে করবে — পর্দা সরিয়ে দেব।'

'এই হবে আপনার বেহেশত?

'হ্যাঁ, এই।'

'আপনার স্ত্রী আপনার কন্যা এরা আপনার পাশে থাকবে না?'

'থাকলে ভাল। না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।'

'ভাল করে ভেবে দেখুন, আপনার বেহেশতে কিছু বাদ পড়ে যায়নি তো?'

'না, সব আছে।'

'খুব প্রিয় কিছু হয়ত বাদ পড়ে গেল।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এক্ষুণি বেহেশতটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি হাসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, ও, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। ভাল একটা আয়না লাগবে। এক সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায় এ রকম একটা আয়না। আমার একটা মেয়েলি স্বভাব আছে। আয়নায় নিজেকে দেখতে আমার ভাল লাগে।

'সবারই আয়নায় নিজেকে দেখতে ভাল লাগে।'

আসাদুল্লাহ সাহেব চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুমি কি জান আয়নায় মানুষ যে ছবিটা দেখে সেটা আসলে ভুল ছবি? উল্টো ছবি। আয়নার ছবিটাকে বলে মিরর ইমেজ। আয়নায় নিজেকে দেখা যায় না — উল্টোমানুষ দেখা যায়।

'এমন একটা আয়না কি বানানো যায় না যেখানে মানুষ যেমন তেমনই দেখা যাবে?'

'সেই চেষ্টা কেউ করেনি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভুরু কুঁচকে ফেললেন। আমি বললাম, এত চিন্তিত হয়ে কি ভাবছেন?

'ভাবছি, বেহেশতের পরিকল্পনায় কিছু বাদ পড়ে গেল কি-না।'

আসাদুল্লাহ সাহেব মৃত্যুর আগেই তাঁর বেহেশত পেয়ে গেছেন। তাঁর চারটা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও এক মে মাসে ঢাকা শহরে রিকশা নিয়ে বের হলেন। গাড়িতে চড়লে আকাশ দেখা যায় না। রিকশায় চড়লে আকাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায় বলেই রিকশা নেয়া। আকাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন, একটা টেম্পো এসে রিকশাকে ধাক্কা দিল। এমন কিছু ভয়াবহ ধাক্কা না, তারপরেও তিনি রিকশা থেকে পড়ে গেলেন — মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেল। পেরোপ্লাজিয়া হয়ে গেল। সুষুম্নাকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাঁর বাকি জীবনটা কাটবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। ডাক্তাররা সে রকমই বলেছেন।

আমি তাঁকে একদিন দেখতে গেলাম। যে ঘরে তিনি আছেন তার ঠিক মাঝখানে বড় একটা বিছানা। বিছানায় পাঁচ-ছ'টা বালিশ। তিন পাশে আলমিরা ভর্তি বই। হাতের কাছে স্টেরিও সিস্টেম। বিছানার মাথার কাছে বড় জানালা। জানালায় ভিনিসিয়ান ব্লাইন্ড। সবই আছে, শুধু কোন আয়না চোখে পড়ল না।

আমাকে দেখেই আসাদুল্লাহ সাহেব হাসিমুখে বললেন, খবর কি হিমু সাহেব?

আমি বললাম, জ্বি ভাল।

'তোমার কাজ তো শুনি রাস্তায় হাঁটাহাটি করা — হাঁটাহাটি ঠিকমত হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'কি খাবে বল, চা না কফি? একবার বেল টিপলে চা আসবে। দু'বার টিপলে কফি। খুব ভাল ব্যবস্থা।'

'কফি খাব।'

আসাদুল্লাহ সাহেব দু'বার বেল টিপলেন। আবারও হাসলেন। তাঁর হাসি আগের মতই সুন্দর। প্রকৃতি তাঁকে বিছানায় ফেলে দিয়েছে কিন্তু সৌন্দর্য হরণ করেনি। সেদিন বরং হাসিটা আরো বেশি সুন্দর লাগল।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'জীবিত অবস্থাতেই আমি আমার কল্পনার বেহেশত পেয়ে গেছি। আমার কি উচিত না গড অলমাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হওয়া?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কবিতা শুনবে?'

'আপনি শুনাতে চাইলে শুনব।'

'আগে কবিতা ভাল লাগতো না। ইদানীং লাগছে — শোন . . .'

আসাদুল্লাহ সাহেব কবিতা আবৃত্তি করলেন। ভদ্রলোকের সব কিছুই আগের মত আছে। শুধু গলার স্বরে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। মনে হয় অনেক দূর থেকে কথা বলছেন —

> "এখন বাতাস নেই — তবু
> শুধু বাতাসের শব্দ হয়
> বাতাসের মত সময়ের।
> কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
> কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
> হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে।"

'বল দেখি কার কবিতা?'

'বলতে পারছি না, আমি কবিতা পড়ি না।'

'কবিতা পড় না?'

'জ্বি না। আমি কিছুই পড়ি না। দু'-একটা জটিল কবিতা মুখস্থ করে রাখি মানুষকে ভড়কে দেবার জন্যে। আমার কবিতা-প্রীতি বলতে এইটুকুই।'

কফি চলে এসেছে। গন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভাল কফি। আমি কফি খাচ্ছি। আসাদুল্লাহ সাহেব উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর হাতে কফির কাপ। তিনি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে। সেই জানালায় ভারি পর্দা। আকাশ দেখার উপায় নেই। আসাদুল্লাহ সাহেবের এখন হয়ত আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে না।



'কেমন আছেন আসগর সাহেব?'

'জ্বি ভাল।'

'কি রকম ভাল?'

আসগর সাহেব হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে মনে হল না তিনি ভাল। মৃত্যুর ছায়া যাদের চোখে পড়ে তারা এক বিশেষ ধরনের হাসি হাসে। উনি সেই হাসি হাসছেন।

আমি একবার ময়মনসিংহ সেন্ট্রাল জেলে এক ফাঁসির আসামী দেখতে গিয়েছিলাম। ফাঁসির আসামী কিভাবে হাসে সেটা আমার দেখার শখ। ফাঁসির আসামীর নাম হোসেন মোল্লা. তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হল। শুধু যক্ষ্মা রোগীর মত জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখও অস্থির, একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে। বেচারার ফাঁসির দিন-তারিখ জেলার সাহেব ঠিক করতে পারছেন না, কারণ বাংলাদেশে নাকি দুইভাই আছে যারা বিভিন্ন জেলখানায় ফাঁসি দিয়ে বেড়ায়। তারা ডেট দিতে পারছে না। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে আমি যেদিন গিয়েছি সেদিনই দুই ভাই চলে এসেছে। পরদিন ভোরে হোসেন মোল্লার সময় ধার্য হয়েছে। হোসেন মোল্লা আমাকে শান্ত গলায় বলল, "ভাই সাহেব, এখনো হাতে মেলা সময়। এই ধরেন, আইজ সারা দিন পইরা আছে, তার পরে আছে গোটা একটা রাইত। ঘটনা ঘটনের এখনো মেলা দেরি।" বলেই হোসেন হাসল। সেই হাসি দেখে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। প্রেতের হাসি।

আসগর সাহেবের হাসি দেখেও গায়ে কাঁটা দিল। কি ভয়ংকর হাসি! আমি বললাম, ভাই, আপনার কি হয়েছে? ডাক্তার বলছে কি?

'আলসার। সারাজীবন অনিয়ম করেছি — খাওয়া-দাওয়া সময়মত হয় নাই, সেখান থেকে আলসার।'

'পেটে রোলারের গুঁতাও তো খেয়েছিলেন।'

'রোলারের গুঁতা না খেলেও যা হবার হত। সব কপালের লিখন, তাই না হিমু ভাই?'

'তা তো বটেই।'

'দূরে বসে চিকন কলমে একজন কপাল ভর্তি লেখা লেখেন। সেই লেখার উপরে জীবন চলে।'

'হুঁ। মাঝে মাঝে ওনার কলমের কালি শেষ হয়ে যায়, তখন কিছু লেখেন না। মুখে বলে দেন — "যা ব্যাটা নিজের মত চড়ে খা" — এই বলে নতুন কলম নিয়ে অন্য একজনের কপালে লিখতে বসেন।'

'বড়ই রহস্য এই দুনিয়া!'

'রহস্য তো বটেই — এখন বলুন আপনার চিকিৎসার কি হচ্ছে?'

'অপারেশন হবার কথা।'

'হবার কথা, হচ্ছে না কেন?'

'দেশে এমন সমস্যা। ডাক্তাররা ঠিকমত আসতে পারেন না। অল্প সময়ের জন্যে অপারেশন থিয়েটার খোলে। আমার চেয়েও যারা সিরিয়াস তাদের অপারেশন হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'মৃত্যু নিয়ে আমার কোন ভয়-ভীতি নাই হিমু ভাই।'

আমি আবারও বললাম, ও আচ্ছা।

'ভালমত মরতে পারাও একটা আনন্দের ব্যাপার।'

'আপনি শিগগিরই মারা যাচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'মরে গেলে সাত হাজার টাকাটার কি হবে? ঐ লোক যে কোনদিন চলে আসতে পারে।'

'ও আসবে না।'

'বুঝলেন কি করে আসবে না?'

'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'তার সঙ্গে কথা হয়েছে মানে? সে কি হাসপাতালে এসেছিল?'

'জ্বি।'

'আসগর ভাই, ব্যাপারটা ভালমত বুঝিয়ে বলুন তো। আমি ঠিকমত বুঝতে পারছি না।'

আসগর সাহেব মৃদু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। বোঝা যাচ্ছে যা বলছেন — খুব আগ্রহ নিয়ে বলছেন।

'বুঝলেন হিমু ভাই — প্রচণ্ড ব্যথার জন্য রাতে ঘুমাতে পারি না। গত রাতে ডাক্তার সাহেব একটা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। রাত তিনটার দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি খুব পানির পিপাসা। হাতের কাছে টেবিলের উপর একটা পানির জগ আছে। জগে পানি নাই। জেগে আছি — নার্সদের কেউ এদিকে আসলে পানির কথা বলব। কেউ আসছে না। হঠাৎ কে যেন দুবার কাশল। আমার টেবিল

উত্তর দিকে — কাশিটা আসল দক্ষিণ দিক থেকে। মাথা ঘুরিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেখি — মনসুর।'

'মনসুর কে?'

'যে আমাকে সাত হাজার এক টাকা দিয়ে গিয়েছিল — সে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি গেলাম রেগে। এই লোকটা আমাকে কি যন্ত্রণায় ফেলেছে ভেবে দেখুন দেখি। আমি বললাম — তোমার ব্যাপারটা কি? কোথায় ছিলে তুমি? তুমি কি জান তুমি আমাকে কি যন্ত্রণায় ফেলেছ? মনসুর চুপ করে রইল। মাথাও তোলে না। আমি বললাম, কথা বল না কেন? শেষে সে বলল, ভাইজান, আমি আসব ক্যামনে? আমার মৃত্যু হয়েছে। আপনে যেমন মনকষ্টে আছেন আমিও মনকষ্টে আছি। এত কষ্টের টাকা পরিবাররে পাঠাইতে পারি নাই।

আমি বললাম, তুমি ঠিকানা বল আমি পাঠিয়ে দিব। টাকার পরিমাণ আরো বেড়েছে। পোস্টাপিসের পাসবইয়ে টাকা রেখে দিয়েছিলাম। বেড়ে ডবলের বেশি হবার কথা। আমি খোঁজ নেই নাই। তুমি ঠিকানাটা বল।

মনসুর আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমি বললাম, কথা বল। চুপ করে আছ কেন? মনসুর বলল — ঠিকানা মনে নাই স্যার। পরিবারের নামও মনে নাই। — বলেই কান্না শুরু করল। তখন একজন নার্স ঢুকল — তাকিয়ে দেখি মনসুর নাই। আমি নার্সকে বললাম, সিস্টার, পানি খাব। তিনি আমাকে পানি খাইয়ে চলে গেলেন। আমি সারারাত জেগে থাকলাম মনসুরের জন্যে। তার আর দেখা পেলাম না। এই হচ্ছে হিমু ভাই ঘটনা।'

'এটা কোন ঘটনা না — এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেছেন।'

'জ্বি না ভাই সাহেব, স্বপ্ন না। স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা। মনসুর আগের মতই আছে, তার কোন পরিবর্তন হয় নাই।'

'আসগর ভাই, মনসুর মরে ভূত হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছে? আপনার কথা তার মনে আছে অথচ পরিবারের নাম-ঠিকানা ভুলে গেছে — এটা কি হয়? হয় না। এই ধরনের ঘটনা স্বপ্নে ঘটে। আপনাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে — আপনি তার মধ্যে স্বপ্নের মত দেখেছেন।'

'স্বপ্ন না হিমু ভাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান, স্বপ্ন না।'

'আমার মৃত্যুর পর আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে হিমু ভাই।'

'যা বলবেন করব।'

'কাজগুলি কি বলব?'

'আপনি নিশ্চয়ই দু'-একদিনের মধ্যে মারা যাচ্ছেন না। কিছু সময় তো হাতে আছে?'

'কি করে বলব ভাই সাহেব — হায়াত-মউত তো আমাদের হাতে না।'

'কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মৃত্যু আপনার নিজের হাতে। শুনুন আসগর সাহেব, আপনাকে এখন মরলে চলবে না — আমাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে। আপনার মুক্তার মত হাতের লেখায় আপনি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখবেন।'

'কাকে লিখব?'

'একটা মেয়েকে লিখবেন। তার নাম মারিয়া। খুব দামী কাগজে খুব সুন্দর কালিতে চিঠিটা লিখতে হবে।'

'অবশ্যই লিখব হিমু ভাই। আনন্দের সঙ্গে লিখব।'

'সমস্যা হল কি জানেন? অসহযোগের জন্যে দোকানপাট সব বন্ধ। দামী কাগজ যে কিনব সেই উপায় নেই। কাজেই অসহযোগ না কাটা পর্যন্ত যেভাবেই হোক আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা মনে রাখবেন। আমাকে যদি চিঠিটা লিখে না দিয়ে যান তাহলে আমার একটা আফসোস থাকবে।'

'আপনার চিঠি আমি অবশ্যই লিখে দেব হিমু ভাই।'

'তাহলে আজ উঠি।'

'আরেকটু বসেন।'

'অসুস্থ মানুষের পাশে বসে থাকতে ভাল লাগে না।'

আসগর সাহেব নিচু গলায় বললেন, আমার শরীরটা অসুস্থ কিন্তু হিমু ভাই মনটা সুস্থ। আমার মনে কোন রোগ নাই।

আমি চমকে তাকালাম। মৃত্যু-লক্ষণ বলে একটা ব্যাপার আছে। মৃত্যুর আগে আগে এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মানুষ হঠাৎ করে উচ্চস্তরের দার্শনিক কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তাদের চোখের জ্যোতি নিভে যায়। চোখে কোন প্রাণ থাকে না। শরীরের যে অংশ সবার আগে মারা যায় — তার নাম চোখ।

'হিমু ভাই!'

'জ্বি।'

'ডাক চলাচল কি আছে?'

'কিছুই চলছে না — ডাক চলবে কি ভাবে?'

'আমার আত্মীয়স্বজনদের একটু খবর দেয়া দরকার। ওদের দেখার জন্য যে মনটা ব্যস্ত তা না — অসুস্থ ছিলাম এই খবরটা তারা না পেলে মনে কষ্ট পাবে।'

'ডাক চলাচল শুরু হলেই খবর দিয়ে দেব।'

'মানুষ খুব কষ্ট করছে, তাই না হিমু ভাই?'

'বড় বড় নেতারা যদি ভুল করেন তাহলে সাধারণ মানুষ তো কষ্ট করবেই।'

'আমরা যারা ছোট মানুষ আছি হিমু ভাই —আমরাও ভুল করি। মানুষের জন্মই হয়েছে ভুল করার জন্য। তবে হিমু ভাই, ছোট মানুষের ভুল ছোট ছোট।

তাতে তার নিজের ক্ষতি, আর কারোর ক্ষতি হয় না। বড় মানুষের ভুলগুলোও বড় বড়। তাদের ভুলে সবার ক্ষতি হয়। আমরা ছোট মানুষরা নিজেদের মঙ্গল চাই। বড় মানুষরাও তাঁদের মঙ্গল চান। কিন্তু হিমু ভাই, তাঁরা ভুলে যান, যেহেতু তাঁরা বড় সেহেতু তাঁদের নিজেদের মঙ্গল দেখলে হবে না। তাঁদের দেখতে হবে সবার মঙ্গল। ঠিক বলেছি?'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে এই সব ঠিক কথা বলে লাভ কি? যাঁদের বলা দরকার তাঁদের বললে তো তাঁরা শুনবেন না।'

'একটা কি ব্যবস্থা করা যায় হিমু ভাই — আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দু'টা কথা বলব, শেখ হাসিনার সঙ্গে দু'টা কথা বলব — এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তো কথা বলা যাবে না। উনি জেলে।'

কারো সঙ্গেই কথা বলা যাবে না — নেতারা সবাই আসলে জেলে। নিজেদের তৈরি জেলখানায় তাঁরা আটকা পড়ে আছেন। সেই জেলখানা পাহারা দিচ্ছে তাঁদেরই প্রিয় লোকজন। তাঁরা তা জানেন না। তাঁরা মনে করেন তাঁরা স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ . . .আসগর সাহেব !'

'জ্বি হিমু ভাই।'

'উচ্চস্তরের চিন্তাভাবনা করে কোন লাভ নেই। আপনি ঘুমাবার চেষ্টা করেন।'

'জ্বি আচ্ছা। আপনাকে একটা কথা বলব হিমু ভাই, যদি মনে কিছু না করেন।'

'জ্বি না, মনে কিছু করব না।'

'আপনি যে চিঠিটা আমাকে দিয়ে লেখাবেন সেই চিঠির কাগজটা আমি কিনব।'

'সেটা হলে তো খুবই ভাল হয়। আমার হাত একেবারে খালি।'

'বাংলাদেশের সবচে দামী কাগজটা আমি আপনার জন্যে কিনব হিমু ভাই।'

'শুধু কাগজ কিনলে তো হবে না — কলমও লাগবে, কালিও লাগবে। সবচে দামী কাগজে দু'টাকা দামের বল পয়েন্টে লিখবেন তা তো হয় না। দামী কাগজে লেখার জন্যে লাগে দামী কলম।'

'খুবই খাঁটি কথা বলেছেন হিমু ভাই — কলম আর কালিও আমি কিনব। আমি যে আপনাকে কি পছন্দ করি আপনি জানেন না হিমু ভাই।'

'জানব না কেন, জানি। ভালবাসা মুখ ফুটে বলতে হয় না। ভালবাসা টের পাওয়া যায়। আজ যাই আসগর সাহেব ! দেশ স্বাভাবিক হোক। দোকানপাট খুলুক — আপনাকে সঙ্গে নিয়ে কাগজ-কলম কিনে আনব।'

'অবশ্যই। অবশ্যই।'

'আর ইতিমধ্যে যদি মনসুর এসে আপনাকে বিরক্ত করে তাহলে কষে ধমক লাগাবেন। মানুষ হয়ে ভূতদের হাংকিপাংকি সহ্য করা কোন কাজের কথা না।'

আজ হরতালের কত দিন চলছে? মনে হচ্ছে সবাই দিন-তারিখের হিসেব রাখা

ভুলে গেছে। নগরীর জন্ডিস হয়েছে। নগরী পড়ে আছে ঝিম মেরে। এই রোগের চিকিৎসা নেই — বিশ্রামই একমাত্র চিকিৎসা। নগরী বিশ্রাম নিচ্ছে। আগের হরতালগুলিতে মোটামুটি আনন্দ ছিল। লোকজন ভিডিও ক্যাসেটের দোকান থেকে ক্যাসেট নিয়ে যেত। স্বামীরা দুপুরে স্ত্রীদের সঙ্গে ঘুমানোর সুযোগ পেত। স্ত্রীরা আঁতকে উঠে বলত — এ কি! দিনে-দুপুরে দরজা লাগাচ্ছ কেন? বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে। স্বামী উদাস গলায় বলতো, আজ হরতাল না?

এখনকার অবস্থা সে রকম না, এখন অন্য রকম পরিবেশ। জন্ডিসে আক্রান্ত নগরী রোগ সামলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারবে তো — এটাই সবার জিজ্ঞাসা। নাকি নগরীর মৃত্যু হবে? মানুষের মত নগরীরও মৃত্যু হয়।

আমি হাঁটছি। আমার পাশে পাশে হাঁটছে বাদল। আমি বললাম — দীর্ঘ হরতালের কিছু কিছু উপকারিতা আছে। বল তো কি কি?

'রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না।'

'গুড। হয়েছে — আর কি?'

'পলিউশন কমেছে — গাড়ির ধোঁয়া, কার্বন মনক্সাইড কিচ্ছু নেই।'

'ভেরি গুড।'

'লোকজন বেশি হাঁটাহাঁটি করছে, তাদের স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে। ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা কমছে।'

'হয়েছে — আর কি?'

'আরবদের কাছ থেকে আমাদের পেট্রোল কিনতে হচ্ছে না। কিছু ফরেন কারেন্সি বেঁচে যাচ্ছে।'

'হুঁ।'

'আমরা পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারছি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে।'

'হুঁ।'

'পলিটিক্স নিয়ে সবাই আলোচনা করছি — আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ নিয়ে সবাই ভাবছি।'

'আর কিছু আছে?'

'আর তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'আরো অনেক আছে। ভেবে ভেবে সব পয়েন্ট বের কর, তারপর একটা লিফলেট ছাড়ব।'

'তাতে লাভ কি?'

'আছে, লাভ আছে।'

'তোমার ভাবভঙ্গি আমি কিছুই বুঝি না। তুমি কোন দলের লোক বল তো? আওয়ামী লীগ, না বিএনপি?'

'আওয়ামী লীগ যখন খারাপ কিছু করে তখন আমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করি। আর বিএনপি যখন খারাপ কিছু করে তখন বিএনপির সমর্থক।'

'এর মানে কি?'

'ভাল কাজের সমর্থন সব সময়ই থাকে। খারাপ কাজগুলির সমর্থনের লোক পাওয়া যায় না। আমি সেই লোক। খারাপ কাজের জন্যেও সমর্থন লাগে। কারণ সব খারাপের মধ্যেও কিছু মঙ্গল থাকে।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায় হিমু দা?'

'একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'কে? মারিয়া?'

'উহুঁ, তার নাম জয়গুন।'

'জয়গুন কে?'

'তুই চিনবি না — খারাপ ধরনের মেয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

বাদল চমকাল না বা বিস্মিত হল না। সে আমার আদর্শ ভক্ত। দলপতির কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে কিছু বলবে না। বিস্মিত হবে না, চমকাবে না। অন্ধের মত অনুসরণ করবে। একদল মানুষ কি শুধু অনুসরণ করার জন্যেই জন্মায়?

প্রথম তিনটা টোকা, তারপর একটা, তারপর আবার তিনটা। এরকম করতে থাকলে জয়গুন নামের অতি রূপবতী এক তরুণীর এসে দরজা খুলে দেবার কথা। যার শাড়ি থাকবে এলোমেলো। যার ব্লাউজের দুটা বোতাম নেই —।

বেশ কয়েকবার মোর্স কোডের ভঙ্গিতে তিন এক তিন এক শব্দ করার পর দরজা সামান্য খুলল। সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না দরজা কে খুলেছে। কানা কুদ্দুস বলে দিয়েছিল, দরজা খুলবে জয়গুন। সেই ভরসাতে আন্দাজের উপর বললাম — কেমন আছ জয়গুন?

ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল —আপনে কে?

'আমার নাম হিমু।'

দরজা খুলে গেল। আমার সামনে জয়গুন দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর শাড়ি মোটেও এলোমেলো নয়। তার ব্লাউজের বোতামও ঠিক আছে। খুব রূপবতী মেয়ে দেখব বলে এসেছিলাম, দুধে আলতা রঙের একজনকে দেখছি — তাকে রূপবতী বলার কোন কারণ নেই। দাঁত উঁচু। যথেষ্ট মোটা। থপ থপ করে হাঁটছে। একেক জনের সৌন্দর্য একেক রকম। কুদ্দুসের কাছে জয়গুন হল — হেলেন অব ট্রয়। জয়গুন মধুর গলায় বলল, ও আল্লা, ভিতরে আসেন।

'আমি সঙ্গে করে আমার এক ফুপাতো ভাইকে নিয়ে এসেছি। ওর নাম বাদল।'

'অবশ্যই আনবেন। ছোট ভাই, আস।'

জয়গুন হাত ধরে বাদলকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাদল সংকুচিত হয়ে রইল। আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে জয়গুনের ঘর দেখছি। সাজানো-গোছানো ঘর। রঙিন টিভি আছে। ভিসিআর আছে। এই মুহূর্তে ভিসিআর-এ হিন্দী ছবি চলছে।

জয়গুন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, সময় কাটে না, এই জন্যে রোজ তিনটা-চাইরটা কইরা ছবি দেখি। আপনেরা আরাম কইরা বসেন। এসি ছাড়ি?

'এসি আছে?'

'জ্বি আছে।'

'ঠাণ্ডা বাতাসে শইল্যে বাত হয়, এই জন্যে এসি ছাড়ি না। ফ্যান দিয়া কাম সারি।'

'আমাদের জন্যে এসি ছাড়বে — এতে তোমার আবার বাত হবে না তো।'

'কি যে কন হিমু ভাইজান! অল্প সময়ে আর কি বাত হইব।'

অল্প সময় তো না — আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। এসেছি যখন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ভিসিআর-এ একটা ছবি দেখে যাই। অনেকদিন হিন্দী ছবি দেখা হয় না। তোমার অসুবিধা হবে?'

'কি যে কন ভাইজান! আফনে সারাজীবন থাকলেও অসুবিধা নাই।'

'তুমি একা থাক?'

'হ, একাই থাকি।'

'রান্না-বান্না কে করে?'

'কেউ করে না। হোটেল থাইক্যা খাওন আসে। কাজকামের লোক রাখন আমার পুষায় না। খালি ভ্যান ভ্যান করে। আমার হোটেলের সাথে কনটাক।'

'ভাল ব্যবস্থা তো।'

' 'কপি' খাইবেন? — কপি বানানির জিনিস আছে।'

'হ্যাঁ, 'কপি' খাওয়া যায়।'

জয়গুন অতি ব্যস্ততার সঙ্গে 'কপি' আনতে গেল। আমি জয়গুনের বিছানায় পা তুলে উঠে বসতে বসতে বললাম — বাদল আয়, কোলবালিশে হেলান দিয়ে আরাম করে বোস। একটা হিন্দী ছবি দেখি। দু'দিন পর গায়ে কেরোসিন ঢেলে মরে যাবি — হিন্দী ছবি দেখে মনটা ঠিকঠাক কর।

'তুমি কি সত্যি সত্যি ছবি দেখবে?'

'অবশ্যই।'

'এই মেয়েটাকে তুমি চেন কিভাবে?'

'আমি চিনি না — কানা কুদ্দুস চেনে।'

'কানা কুদ্দুস কে?'

ভয়াবহ খুনী। মানুষ মারা তার কাছে কোন ব্যাপারই না। মশা মারার মতই সহজ।'

'এই ভদ্রমহিলা কি ওনার স্ত্রী?'

'প্রায় সে রকমই। জয়গুন হচ্ছে কানা কুদ্দুসের বনলতা সেন।'

'ভদ্রমহিলা কি সুন্দর দেখেছ হিমু দা?'

'সুন্দর?'

'আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, যতই দেখছি — ততই অবাক হচ্ছি।'

'তোর মনে হচ্ছে না দাঁতগুলি বেশি উঁচু?'

'তোমার দাঁতের দিকে তাকাবার দরকার কি?'

'তাও তো বটে। দাঁতের দিকে তাকাব কেন? হাতি হলে দাঁতের দিকে তাকানোর একটা ব্যাপার চলে আসত। গজদন্ত বিরাট ব্যাপার। মানবদন্ত তেমন কোন ব্যাপার না। মানবদন্তের জন্ম হয় ডেনটিস্টের তুলে ফেলার জন্যে।'

'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার দরকার আছে?'

'না, দরকার নেই।'

জয়গুন মগে করে 'কপি' নিয়ে এসেছে। এক এক মগে এক এক পোয়া করে চিনি দিয়ে বাঁধানো ঘন এক সিরাপ জাতীয় বস্তু। আমি মুখে দিয়ে বললাম, অপূর্ব! আমি যা করি বাদলও তাই করে। কাজেই বাদলও চোখ বড় বড় করে বলল — অপূর্ব!

জয়গুনের সুন্দর মুখ আনন্দে ভরে গেল। সে বলল, ছবি দেখবেন ভাইজান?

'হ্যাঁ দেখব। ভাল একটা কিছু দাও।'

'পুরানো ছবি দেখবেন? দিদার আছে — দিলীপ কুমারের ছবি।'

'দিলীপ কুমারের ছবি দেখা যেতে পারে।'

'বেলেক এন্ড হোয়াইট।'

'শাদা-কালোর কোন অসুবিধা নেই — তারপর জয়গুন, কুদ্দুসের কোন খবর জান?'

'জ্বি না। মেলা দিন কোন খোঁজ নাই। বুঝছেন ভাইজান, মানুষটার জন্যে অত অস্থির থাকি — হে বুঝে না। কোন দিন কোন্ বিপদে পড়ে! বিপদের কি কোন মা-বাপ আছে? সব কিছুর মা-বাপ আছে। বিপদের মা-বাপ নাই। তারে কে বুঝাইবে কন? আফনেরে খুব মানে। যখন আসে তখনই আফনের কথা কয়। ভাইজান!'

'বল।'

'আফনে তার জন্যে এট্টু দোয়া করবেন ভাইজান।'

'আমার দোয়াতে কোন লাভ হবে না জয়গুন। সে ভয়ংকর সব পাপ করে বেড়াচ্ছে। সেই পাপের শাস্তি তো হবেই।'

'মৃত্যুর পরে আল্লাহ পাক শাস্তি দিলে দিব। এই দুনিয়ায় শাস্তি হইব এটা কেমন বিচার?'

'এটা হচ্ছে জনতার বিচার। আল্লাহ পাক কিছু কিছু শাস্তি জনতাকে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মানুষ ভুল করে — জনতা ভুল করে না।'

জয়গুন ছবি চালিয়ে দিয়েছে। তার চোখ ভর্তি পানি। কানা কুদ্দুসের মত একটি ভয়াবহ পাপীর জন্যে জয়গুনের মত একটি রূপবতী মেয়ে চোখের পানি ফেলছে — কোন মানে হয়? হয় নিশ্চয়ই — সেই মানে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ছবি চলছে। আমি, বাদল এবং জয়গুন ছবি দেখছি। জয়গুন ছবি দেখছে গভীর আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে। আশ্চর্য! বাদলও তাই করছে।

শামসাদ বেগমের কিন্নর কণ্ঠের গান শুরু হল — 'বাচপানকে দিন ভুলানা দেনা।'

বাদলের চোখে পানি। দু'দিন পর গায়ে আগুন লেগে যার মরার কথা সে ছবি দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে — কোন মানে হয়?

'বাদল!'

'জ্বি।'

'তোর গায়ে কেরোসিন ঢালার ব্যাপারটা মনে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার। আর দেরি করা যায় না।'

'কেন?'

'দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সব স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। যা করার তার আগেই করতে হবে।'

'দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে কে বলল?'

'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।'

বাদল কিছু বলল না। আমার কথা সে শুনতে পায়নি। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন দিলীপ কুমারের কর্মকাণ্ডে নিবেদিত। আমি বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া যেতে পারে। হিন্দী আমি বুঝি না। ছবির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। বাদল এবং জয়গুনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে — ছবি দেখার জন্যে হলেও হিন্দী শেখার দরকার ছিল। আমি শুনেছি হিন্দী খুব নাকি মিষ্টি ভাষা। আমার মনে হয় না। লেডিস টয়লেটের হিন্দী হচ্ছে — "দেবীও কি হাগন কুঠি" অর্থাৎ "দেবীদের হাগাঘর"। যে ভাষায় মেয়েদের বাথরুমের এত কুৎসিত নাম সেই ভাষা মিষ্টি হবার কোন কারণ নেই। আমি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।



অনেকদিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি খুব চিন্তিত মুখে আমার বিছানায় বসে আছেন। গায়ে খদ্দরের চাদর। হাত দু'টা কোলের উপরে ফেলে রাখা। চোখে চশমা। চশমার মোটা কাঁচের ভেতর থেকে তাঁর জ্বলজ্বলে চোখ দেখা যাচ্ছে। আমি বাবাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

বাবা বললেন, কেমন আছিস হিমু?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, খুব ভাল আছি বাবা।

বাবা নিচু গলায় বললেন, তুই তো সব গণ্ডগোল করে ফেলেছিস। এত শখ ছিল তুই মহাপুরুষ হবি। এত ট্রেনিং দিলাম . . .

'ট্রেনিং দিয়ে কি আর মহাপুরুষ হওয়া যায় বাবা?'

'ট্রেনিং দিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে মহাপুরুষ হওয়া যাবে না কেন? অবশ্যই যায়। ট্রেনিং ঠিকমত দিতে পারলে . . .'

'তাহলে মনে হয় তোমার ট্রেনিং–এ গণ্ডগোল ছিল।'

'উহুঁ, ট্রেনিং–এ কোন গণ্ডগোল নেই। তুই নিয়ম–কানুন মানছিস না। মহাপুরুষের প্রথম শর্ত হল — কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর মায়া করবি না। মায়া হবে সার্বজনীন। মায়াটাকে ছড়িয়ে দিবি।'

'তাই তো করছি।'

'মোটেই তা করছিস না। তুই জড়িয়ে পড়ছিস। মারিয়াটা কে?'

'মারিয়া হচ্ছে মরিয়ম।'

'তুই এই মেয়ের সঙ্গে এমন জড়ালি কেন?'

'জড়াইনি তো বাবা। আমি ওর সাংকেতিক চিঠির জবাব পর্যন্ত দেইনি। ও চিঠি দেবার পর ওর বাসায় যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।'

'এটাই কি প্রমাণ করে না তুই জড়িয়ে পড়েছিস? মেয়েটার মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিস।'

'তুমি কি তার বাসায় যেতে বলছ?'

'অবশ্যই যাবি।'

'কিন্তু বাবা, একটা ব্যাপার কি জান? আমার ধারণা, এই যে স্বপ্নটা দেখছি এটা

আসলে দেখছি আমার অবচেতন মনের কারণে। আমার অবচেতন মন চাচ্ছে আমি মারিয়ার সঙ্গে দেখা করি। সেই চাওয়াটা প্রবল হয়েছে বলেই সে তোমাকে তৈরি করে স্বপ্নে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। তুমি আমাকে মারিয়ার বাসায় যেতে বলছ। তুমি আমার অবচেতন মনেরই একটা ছায়া। এর বেশি কিছু না।'

'তা হতে পারে।'

'আমার অবচেতন মন যা চাচ্ছে, তাই তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে।'

'হুঁ। যুক্তির কথা।'

'মহাপুরুষরা কি যুক্তিবাদী হন বাবা?'

'তাঁদের ভেতর যুক্তি থাকে কিন্তু তাঁরা যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হন না।'

'কেন?'

'কারণ যুক্তি শেষ কথা না। শেষ কথা হচ্ছে চেতনা, Conscience.'

'চেতনা কি যুক্তির বাইরে?'

'যুক্তি চেতনার একটা অংশ কিন্তু খুব ক্ষুদ্র অংশ। ভাল কথা, মারিয়া মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দর। আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।'

'চুল কি কোঁকড়ানো, না প্লেইন?'

'চুল কোঁকড়ানো।'

'তোর মা'র চুলও ছিল কোঁকড়ানো। সে অবশ্যি দেখতে শ্যামলা ছিল। যাই হোক, মারিয়া মেয়েটা লম্বা কেমন?'

'গজ ফিতা দিয়ে তো মাপিনি তবে লম্বা আছে।'

'মুখের শেপ কেমন? গোল না লম্বাটে?'

'লম্বাটে।'

'চোখ কেমন?'

'চোখ খুব সুন্দর।'

'চোখ কি খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিস? একটা মানুষের ভেতরটা দেখা যায় চোখের দিকে তাকিয়ে। তুই কি চোখ খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিস?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা হিমু শোন — মেয়েটার ডান চোখ কি বাঁ চোখের চেয়ে সামান্য বড়?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'তোর মা'র চোখ এই রকম ছিল। আমি যখন তাকে ব্যাপারটা বললাম — সে তো কেঁদে–কেটে অস্থির। আমাকে বলে কি, কাজল দিতে গিয়ে এ রকম দেখাচ্ছে। একটা চোখে কাজল বেশি পড়েছে — একটায় কম পড়েছে।'

'মা চোখে কাজল দিত?'

'হ্যাঁ। শ্যামলা মেয়েরা যখন চোখে কাজল দেয় তখন অপূর্ব লাগে।'

'বাবা!'

'হুঁ?'

'এই যে মারিয়া সম্পর্কে তুমি জানতে চাচ্ছ, কেন?'

'তোর মা'র সঙ্গে মেয়েটার মিল আছে কি–না তা জানার জন্যে।'

'বাবা শোন, তুমি এত সব জানতে চাচ্ছ কারণ মেয়েটার বিষয়ে আমার নিজের কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমার অবচেতন মন সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে।'

'হতে পারে।'

'হতে পারে না। এটাই হল ঘটনা। তুমি আমার নিজের তৈরি স্বপ্ন ছাড়া কিছু না।'

'পুরো জগতটাই তো স্বপ্ন রে বোকা।'

'তুমি সেই স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন। আমি এখন আর স্বপ্ন দেখতে চাচ্ছি না। আরাম করে ঘুমাতে চাচ্ছি।'

'চলে যেতে বলছিস?'

'হ্যাঁ, চলে যাও।'

'তুই ঘুমা, আমি পাশে বসে থাকি।'

'কোন দরকার নেই বাবা। তুমি বিদেয় হও।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বিষণ্ন মুখে চলে গেলেন। তার পরপরই আমার ঘুম ভাঙল। মনটা একটু খারাপই হল। বাবা আরো কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থাকলে তেমন কোন ক্ষতি হত না।

আমার বাবা তাঁর পুত্রের জন্যে কিছু উপদেশবাণী রেখে গিয়েছিলেন। ব্রাউন প্যাকেটে মোড়া সেইসব উপদেশবাণীর উপর লেখা আছে কত বয়সে পড়তে হবে। আঠারো বছর হবার পর যে উপদেশবাণী পড়তে বলেছিলেন — তা হল।

হিমালয়

তুমি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছ। আমার অভিনন্দন। অষ্টাদশ বর্ষকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এই বয়সে নারী ও পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের চিন্তা–চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফল শুভ যেমন হয় — মাঝে মাঝে অশুভও হয়।

প্রিয় পুত্র, তোমাকে আজ আমি তরুণ–তরুণীর আকর্ষণের বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল বলিতে চাই। মন দিয়া

পাঠ কর। তরুণ–তরুণীর আকর্ষণের সমগ্র বিষয়টাই পুরাপুরি জৈবিক। ইহা পশু–ধর্ম। এই আকর্ষণের ব্যাপারটিকে আমরা নানানভাবে মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রেম নিয়া কবি, সাহিত্যিক মাতামাতি করিয়াছেন। চিত্রকররা প্রেমিক–প্রেমিকার ছবি অংকন করিয়াছেন। গীতিকাররা গান রচনা করিয়াছেন। গায়করা সেই গান নানান ভঙ্গিমায় গাহিয়াছেন।

প্রিয় পুত্র, প্রেম বলিয়া জগতে কিছু নাই। ইহা শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ প্রকৃতি তৈরি করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার সৃষ্টি বজায় থাকে। নর–নারীর মিলনে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে। প্রকৃতির সৃষ্টি বজায় থাকিবে।

একই আকর্ষণ প্রকৃতি তাঁহার সমস্ত জীবজগতে তৈরি করিয়াছেন। আশ্বিন মাসে কুকুরীর শরীর দুই দিনের জন্য উত্তপ্ত হয়। সে তখন কুকুরের সঙ্গের জন্যে প্রায় উন্মত্ত আচরণ করে। ইহাকে কি আমরা প্রেম বলিব?

প্রিয় পুত্র, মানুষ ভান করিতে জানে, পশু জানে না — এই একটি বিষয় ছাড়া মানুষের সঙ্গে পশুর কোন তফাৎ নাই। যদি কখনো কোনো তরুণীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ কর, তখন অবশ্যই তুমি সেই আকর্ষণের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবে। দেখিবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু তুচ্ছ শরীর। যেহেতু শরীর নশ্বর সেহেতু প্রেমও নশ্বর।

প্রিয় পুত্র, তোমাকে অনেকদূর যাইতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইও। প্রকৃতি তোমার সহায় হউক — এই শুভ কামনা।

আমার বাবা কি আসলেই অপ্রকৃতিস্থ? কাদের আমরা প্রকৃতিস্থ বলব? যাদের চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক পথে চলে তাদের। যারা একটু অন্যভাবে চিন্তা করে তাদের আমরা আলাদা করে ফেলি। তা কি ঠিক? আমার বাবা তাঁর পুত্রকে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছার কথা শোনামাত্রই আমরা তাঁকে উন্মাদ হিসেবে আলাদা করে ফেলেছি। কোন বাবা যদি বলেন, আমি আমার ছেলেকে বড় ডাক্তার বানাব তখন আমরা হাসি না, কারণ তিনি চেনা পথে হাঁটছেন। আমার বাবা তাঁর সমগ্র জীবনে হেঁটেছেন অচেনা পথে। আমি সেই পথ কখনো অস্বীকার করিনি।

স্বপ্ন আমাকে কাবু করে ফেলেছে। সকাল বেলাতেই বিষণ্নবোধ করছি। বিষণ্নতা কাটানোর জন্যে কি করা যায়? মন আরো বিষণ্ন হয় এমন কিছু করা। যেমন রূপার সঙ্গে কথা বলা। অনেকদিন তার সঙ্গে কথা হয় না।

মন এখন বিষণ্ন, রূপার সঙ্গে কথা বলার পর মন নতুন করে বিষণ্ন হবে। পুরানো বিষণ্নতা এবং নতুন বিষণ্নতায় কাটাকাটি হয়ে আমি স্বাভাবিক হব। তারপর যাব আসগর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর কি? চিত্রলেখা নামের ঐ বাড়িতে কি যাব? দেখে আসব মারিয়াকে?

অনেকবার টেলিফোন করলাম রূপাদের বাসায়। টেলিফোন যাচ্ছে, রূপাই টেলিফোন ধরছে, কিন্তু সে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যাচ্ছে। প্রকৃতি চাচ্ছে না আমি রূপার সঙ্গে কথা বলি।



ফুপার বাড়িতে আজ উৎসব।

বাদল তার কেরোসিন টিন ব্যবহার করতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ হয়েছে। খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেছেন। দুই দলের মর্যাদা বহাল আছে। দু'দলই দাবি করছে তারা জিতেছে। দু'দলই বিজয় মিছিল বের করেছে। সব খেলায় একজন জয়ী হন, অন্যজন পরাজিত হন। রাজনীতির খেলাতেই শুধুমাত্র দু'টি দল একসঙ্গে জয়ী হতে পারে অথবা এক সঙ্গে পরাজিত হয়। রাজনীতির খেলা বড়ই মজাদার খেলা। এই খেলায় অংশগ্রহণ তেমন আনন্দের না, দূর থেকে দেখার আনন্দ আছে।

আমি গভীর আনন্দ নিয়ে খেলাটা দেখছি। শেষের দিকে খেলাটায় উৎসব ভাব এসে গেছে। ঢাকার মেয়র হানিফ সাহেব করেছেন জনতার মঞ্চ। সেখানে বক্তৃতার সঙ্গে 'গান–বাজনা' চলছে।

খালেদা জিয়া তৈরি করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চ। সেখানে গান–বাজনা একটু কম, কারণ বেশিরভাগ শিল্পীই জনতার মঞ্চে। তাঁরা গান–বাজনার অভাব বক্তৃতায় পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। গণতন্ত্র মঞ্চ একটু বেকায়দা অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে। তেমন জমছে না। উদ্যোক্তারা একটু যেন বিমর্ষ।

দু'টি মঞ্চ থেকেই দাবি করা হচ্ছে — আমরা ভারত বিরোধী। ভারত বিরোধিতা আমাদের রাজনীতির একটা চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে আসছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের স্বাধীনতার জন্যে তাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল, এই কারণে কি আমরা কোন হীনমন্যতায় ভুগছি?

শুধুমাত্র হীনমন্যতায় ভুগলেই এইসব জটিলতা দেখা দেয়। এই হীনমন্যতা কাটানোর প্রধান উপায় জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। সবাই মিলে সেই চেষ্টাটা কি করা যায় না?

আমাদের সারাদেশে অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ আছে — যে সব ভারতীয় সৈন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন তাঁদের জন্যে আমরা কিন্তু কোন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিনি। কেন করিনি? করলে কি জাতি হিসেবে আমরা ছোট হয়ে যাব?

আমাদের কবি–সাহিত্যিকরা স্বাধীনতা নিয়ে কত চমৎকার সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখলেন — সেখানে কোথাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদানের কোন উল্লেখ নেই। উল্লেখ করলে ভারতীয় দালাল আখ্যা পাবার আশংকা। বাংলাদেশে এই রিস্ক নেয়া যায় না। অন্য একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওঁরা প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের ছেলে–মেয়ে–স্ত্রীর কাছে অন্য দেশের স্বাধীনতা কোন ব্যাপার না। স্বামীহারা স্ত্রী, পিতাহারা সন্তানদের অশ্রুর মূল্য আমরা দেব না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ?

বাংলাদেশের আদর্শ নাগরিক কি করবে? ভারতীয় কাপড় পরবে। ভারতীয় বই পড়বে, ভারতীয় ছবি দেখবে। ভারতীয় গান শুনবে, ছেলে–মেয়েদের পড়াতে পাঠাবে ভারতীয় স্কুল–কলেজে। চিকিৎসার জন্যে যাবে বোম্বাই, ভ্যালোর এবং ভারতীয় গরু খেতে খেতে চোখ–মুখ কুঁচকে বলবে — শালার ইন্ডিয়া! দেশটাকে শেষ করে দিল! দেশটাকে ভারতের খপ্পর থেকে বাঁচাতে হবে।

আমাদের ফুপা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বিজ্ঞ বিজ্ঞ করে বললেন, বুঝলি হিমু, দেশটাকে ভারতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এটা হচ্ছে রাইট টাইম।

আমি বললাম, অবশ্যই।

'ইণ্ডিয়ান দালাল দেশে যে ক'টা আছে, সব ক'টাকে জুতাপেটা করা দরকার।'

আমি বললাম, অবশ্যই।

'দালালদের নিয়ে মিছিল করতে হবে। সবার গলায় থাকবে জুতার মালা।'

'এত জুতা পাবেন কোথায়?'

'জুতা পাওয়া যাবে। জুতা কোন সমস্যা না।'

'অবশ্যই।'

ফুপা অল্প সময়ে যে পরিমাণ মদ্যপান করেছেন তা তাঁর জন্যে বিপজ্জনক। তাঁর আশে–পাশে যারা আছে তাদের জন্যেও বিপজ্জনক। এই অবস্থায় ফুপার প্রতিটি কথায় 'অবশ্যই' বলা ছাড়া উপায় নেই।

আমরা বসেছি ছাদে। বাদল আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে না এই আনন্দ সেলিব্রেট করা হচ্ছে। ফুপা মদ্যপানের অনুমতি পেয়েছেন। ফুপু কঠিন গলায় বলে দিয়েছেন — শুধু দুই পেগ খাবে। এর বেশি এক ফোঁটাও না। খবর্দার! হিমু, তোর উপর দায়িত্ব, তুই চোখে চোখে রাখবি।

আমি চোখে চোখে রাখার পরেও — ফুপার এখন সপ্তম পেগ যাচ্ছে। তাঁর কথাবার্তা সবই এলোমেলো। একটু হিক্কার মতোও উঠছে। বমিপর্ব শুরু হতে বেশি দেরি হবে না।

'হিমু!'

'জ্বি ফুপা।'

'দেশটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে হিমু।'

'অবশ্যই।'

'দেশমাতৃকা অনেক বড় ব্যাপার।'

'জ্বি, ঠিকই বলেছেন। দেশপিতৃকা হলে দেশটাকে রসাতলে নিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না।'

'দেশপিতৃকা আবার কি?'

'ফাদারল্যান্ডের বাংলা অনুবাদ করলাম।'

'ফাদারল্যান্ড কেন বলছিস? জন্মভূমি হল জননী। জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী।'

'ফুপা, আর মদ্যপান করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

'খুব ঠিক হচ্ছে। তোর চেখে দেখার ইচ্ছা থাকলে চেখে দেখ। আমি কিছুই মনে করব না। এইসব ব্যাপারে আমি খুবই লিবারেল।'

'আমার ইচ্ছা করছে না ফুপা।'

'ইচ্ছা না করলে থাক। খেতে হয় নিজের রুচিতে, পরতে হয় অন্যের রুচিতে। ঠিক না?'

'অবশ্যই ঠিক।'

'বুঝলি হিমু, দেশ নিয়ে নতুন করে এখন চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। ভারতের আগ্রাসন বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।'

'আমি গম্ভীর গলায় বললাম, জাতীয় পরিষদে আইন পাস করতে হবে যে, কেউ তাদের ছেলেমেয়েদের ভারতে পড়তে পাঠাতে পারবে না, কারণ ভারতীয়রা আমাদের সন্তানদের ব্রেইন ওয়াশ করে দিচ্ছে, তাই না ফুপা?'

ফুপা মদের গ্লাস মুখের কাছে নিয়েও নামিয়ে নিলেন। কঠিন কোন কথা বলতে গিয়েও বললেন না — কারণ তিনি তাঁর পুত্র বাদলকে ভর্তি করেছেন দার্জিলিং–এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

'হিমু!'

'জ্বি ফুপা।'

'রাজনীতি বাদ দিয়ে চল অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি।'

'জ্বি আচ্ছা। কি নিয়ে আলাপ করতে চান? আবহাওয়া নিয়ে কথা বলবেন?'

'না —।'

'সাহিত্য নিয়ে কথা বলবেন ফুপা? গল্প–উপন্যাস?'

'আরে ধ্যুৎ, সাহিত্য! সাহিত্যের লোকগুলিও বদ। এরা আরো বেশি বদ।'

'তাহলে কি নিয়ে কথা বলা যায়? একটা কোন টপিক বের করুন।'

ফুপা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে টপিক চিন্তা করতে লাগলেন। আমি ছাদে শুয়ে পড়লাম। আকাশে না–কি নতুন কি একটা ধূমকেতু এসেছে — 'হায়াকুতাকা', বেচারাকে দেখা যায় কি–না। নয় হাজার বছর আগে সে একবার

পৃথিবীকে দেখতে এসেছিল। এখন আবার দেখছে। আবারও আসবে নয় হাজার বছর পর। নয় হাজার বছর পর বাংলাদেশকে সে কেমন দেখবে কে জানে।

ধূমকেতু খুঁজে পাচ্ছি না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নীচেই তার থাকার কথা। উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল পাওয়া গেল। এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে জ্বলজ্বল করছে সপ্তর্ষি।

ফুপা জড়ানো গলায় বললেন, কি খুঁজছিস হিমু?

'হায়াকুতাকাকে খুঁজছি।'

'সে কে?'

'ধূমকেতু।'

'চাইনিজ ধূমকেতু না-কি? হায়াকুতাকা — নামটা তো মনে হয় চাইনিজ।'

'জাপানিজ নাম।'

'ও আচ্ছা, জাপানিজ . . . একটা দেশ কোথায় ছিল, এখন কোথায় উঠে গেছে দেখ . . . ধূমকেত-ফেতু সব নিয়ে নিচ্ছে — আমরা কিছুই নিতে পারছি না। বঙ্গোপসাগরে তালপট্টি সেটাও চলে গেল। চলে গেল কি-না তুই বল হিমু?'

'জ্বি, চলে গেছে।'

'বেঁচে থেকে তাহলে লাভ কি?'

'বেঁচে থাকলে আনন্দ করা যায়। মাঝে-মধ্যে মদ্যপান করা যায় . . .'

'এতে লিভারের ক্ষতি হয়।'

'তা হয়।'

'পরিমিত খেলে হয় না। পরিমিত খেলে লিভার ভাল থাকে।'

ফুপার কথা আমি এখন আর শুনছি না। আমি ধূমকেতু খুঁজছি। ধূমকেতুও আমার মতই পরিব্রাজক — সেও শুধুই হেঁটে বেড়ায় . . .।



'আসগর সাহেব কেমন আছেন?'

আসগর সাহেব চোখ মেলে তাকালেন। অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারছেন বলে মনে হল না।

'দেশ তো ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আপনার অপারেশন কবে হবে?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

'ভাল, খুব ভাল।'

'হিমু ভাই!'

'বলুন।'

'আপনার চিঠির জন্যে কাগজ কিনিয়েছি — কলম কিনিয়েছি। রেডিও বন্ড কাগজ, পার্কার কলম।'

'কে কিনে দিল?'

'একজন নার্স আছেন, সোমা নাম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁকে বলেছিলাম, তিনি কিনেছেন।'

'খুব ভাল হয়েছে। অপারেশন শেষ হোক, তারপর চিঠি লেখালেখি হবে।'

'জ্বি না।'

'জ্বি না মানে?'

'আমি বাঁচব না হিমু ভাই, যা লেখার আজই লিখতে হবে।'

'আপনার যে অবস্থা আপনি লিখবেন কিভাবে? আপনি তো কথাই বলতে পারছেন না।'

আসগর সাহেব যন্ত্রের মত বললেন, যা লেখার আজই লিখতে হবে।

তিনি মনে হল একশ' ভাগ নিশ্চিত, অপারেশনের পরে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। বিদায়ের ঘণ্টা তিনি মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন।

'হিমু ভাই!'

'বলুন, শুনছি।'

'আপনার জন্যে কিছুই করতে পারি নাই। চিঠিটাও যদি লিখতে না পারি তাহলে মনে কষ্ট নিয়ে মারা যাব।'

'মনে কষ্ট নিয়ে মরার দরকার নেই — নিন, চিঠি লিখুন। কলমে কালি আছে?'

'জ্বি, সব ঠিকঠাক করা আছে। হাতটা কাঁপে হিমু ভাই — লেখা ভাল হবে না। আমাকে একটু উঠিয়ে বসান।'

'উঠে বসার দরকার নেই। শুয়ে শুয়ে লিখতে পারবেন। খুব সহজ চিঠি। একটা তারা আঁকুন, আবার একটু গ্যাপ দিয়ে চারটা তারা, আবার তিনটা। এই রকম — দেখুন আমি লিখে দেখাচ্ছি —

* * * * * * * *

আসগর সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, এইসব কি?

আমি হাসিমুখে বললাম, এটা একটা সাংকেতিক চিঠি। আমি মেয়েটার কাছ থেকে একটা সাংকেতিক চিঠি পেয়েছিলাম। কাজেই সাংকেতিক ভাষায় চিঠির জবাব।

'তারাগুলির অর্থ কি?'

'এর অর্থটা মজার — কেউ ইচ্ছা করলে এর অর্থ করবে I love you. একটা তারা I, চারটা তারা হল Love, তিনটা তারা হল You. আবার কেউ ইচ্ছা করলে অর্থ করতে পারে — I hate you.

আসগর সাহেব কাঁপা কাঁপা হাতে স্টার এঁকে দিলেন। আমি সেই তারকাচিহ্নের চিঠি পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম — আসগর সাহেবের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে তাহলে আর দেখা হচ্ছে না।

'জ্বি না।'

'মৃত্যু কখন হবে বলে আপনার ধারণা?'

আসগর সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, রাতে একবার এসে খোঁজ নিয়ে যাব। মরে গেলে তো চলেই গেলেন। বেঁচে থাকলে কথা হবে।

'জ্বি আচ্ছা।'

'আর কিছু কি বলবেন? মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনকে কিছু বলা কিংবা . . . '

'মনসুরের পরিবারকে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন ভাই সাহেব। মনসুর এসে পরিবারের ঠিকানা দিয়ে গেছে।'

'ঠিকানা কি?'

'কাগজে লিখে রেখেছি — পোস্টাপিসের কিছু কাগজ, পাসবই সব একটা বড় প্যাকেটে ভরে রেখে দিয়েছি। আপনার নামে অথরাইজেশন চিঠিও আছে।'

'ও আচ্ছা, কাজকর্ম গুছিয়ে রেখেছেন?'

'জ্বি — যতদূর পেরেছি।'

'অনেকদূর পেরেছেন বলেই তো মনে হচ্ছে — ফ্যাকরা বাঁধিয়েছে মনসুর — সে যদি ভূত হয়ে সত্যি সত্যি তার পরিবারের ঠিকানা বলে দিয়ে যায় তাহলে বিপদের কথা।'

'কিসের বিপদ হিমু ভাই?'

'তাহলে তো ভূত বিশ্বাস করতে হয়। রাত-বিরাতে হাঁটি, কখন ভূতের খপ্পরে পড়ব!'

'জগৎ বড় রহস্যময় হিমু ভাই।'

'জগৎ মোটেই রহস্যময় না। মানুষের মাথাটা রমস্যময়। যা ঘটে মানুষের মাথার মধ্যে ঘটে। মনসুর এসেছিল আপনার মাথার ভেতর। আমার ধারণা, সে তার পরিবারের ঠিকানা ঠিকই দিয়েছে। আপনার মাথা কিভাবে কিভাবে এই ঠিকানা বের করে ফেলেছে।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না হিমু ভাই।'

'বুঝতে না পারলেও কোন অসুবিধা নেই। আমি নিজেও আমার সব কথা বুঝতে পারি না।'

আমি আসগর সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। গফুরের মেয়েটার সঙ্গে দু'টা কথা বলার ইচ্ছা ছিল। মেয়েটাকে দেখলাম না। গফুর তার বিছানায় হা করে ঘুমাচ্ছে। তার মুখের উপর একটা মাছি ভন ভন করছে ; সেই মাছি তাড়াবার চেষ্টা করছেন বয়স্কা এক মহিলা। সম্ভবত গফুরের স্ত্রী। স্বামীকে তিনি নির্বিঘ্নে ঘুমুতে দিতে চান।

রিকশা নিয়ে নিলাম। মারিয়ার বাবাকে দেখতে যাব। পাঁচ বছর পর ভদ্রলোককে দেখতে যাচ্ছি। এই পাঁচ বছরে তিনি আমার কথা মনে করেছেন। আমি গ্রেফতার হয়েছি শুনে চিন্তিত হয়ে চারদিকে টেলিফোন করেছেন। আমি তাঁর কথা মনে করিনি। আমি আমার বাবার কঠিন উপদেশ মনে রেখেছি —

প্রিয় পুত্র,

মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। মায়ায় আবদ্ধ হওয়াই তাহার নিয়তি। তোমাকে আমি মায়ামুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া বড় করিয়াছি। তারপরেও আমার ভয় — একদিন ভয়ঙ্কর কোন মায়ায় তোমার সমস্ত বোধ, সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইবে। মায়া কূপবিশেষ, সে কূপের গভীরতা মায়ায় যে আবদ্ধ হইবে তাহার মনের গভীরতার উপর নির্ভরশীল। আমি তোমার মনের গভীরতা সম্পর্কে জানি — কাজেই ভয় পাইতেছি — কখন না তুমি মায়া নামক অর্থহীন কূপে আটকা পড়িয়া যাও। যখনই এইরূপ কোন সম্ভাবনা দেখিবে তখনই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবে। মায়া নামক রঙ্গিন কূপে পড়িয়া জীবন কাটানোর জন্য তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিও না। . . .

আমি আমার অপ্রকৃতিস্থ পিতার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিনি। আমি যখনই মায়ার কূপ দেখেছি তখনি দূরে সরে গেছি। দূরে সরার প্রক্রিয়াটি কত যে কঠিন তা কি আমার অপ্রকৃতিস্থ দার্শনিক পিতা জানতেন? মনে হয় জানতেন না। জানলে মায়ামুক্তির কঠিন বিধান রাখতেন না।

আসাদুল্লাহ সাহেব আজ এতদিন পরে আমাকে দেখে কি করবেন? খুব কি উল্লাস প্রকাশ করবেন? না, তা করবেন না। যে সব মানুষ সীমাহীন আবেগ নিয়ে জন্মেছেন তাঁরা কখনো তাঁদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাঁদের আচার-আচরণ রোবটধর্মী। যাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন মধ্যম শ্রেণীর আবেগ নিয়ে, তাঁদের আবেগের প্রকাশ অতি তীব্র। এঁরা প্রিয়জনদের দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেন।

আমার ধারণা, আসাদুল্লাহ সাহেব আমাকে দেখে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলবেন, তারপর কি খবর হিমু সাহেব?

এই যে দীর্ঘ পাঁচ বছর দেখা হল না সে প্রসঙ্গে একটা কথাও বলবেন না। পুলিশের হাতে কিভাবে ধরা পড়েছি, কিভাবে ছাড়া পেয়েছি সেই প্রসঙ্গেও কোন কথা হবে না। দেশ নিয়েও কোন কথা বলবেন না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডকে তিনি দেশ ভাবেন না। তাঁর দেশ হচ্ছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি। তিনি নিজেকে অনন্ত নক্ষত্রবীথির নাগরিক মনে করেন। এইসব নাগরিকদের কাছে জাগতিক অনেক কর্মকাণ্ডই তুচ্ছ। বাবা বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই তাঁকে আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। দু'জন দু'মেরু থেকে কথা শুরু করতেন। সেইসব কথা না জানি শুনতে কত সুন্দর হত!

মারিয়ার মা'কে আমি খালা ডাকি। হাসি খালা। মহিলারা চাচীর চেয়ে খালা ডাক বেশি পছন্দ করেন। খালা ডাক মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনেক কাছের ডাক। খালা ডেকেও আমার তেমন সুবিধা অবশ্যি হয়নি। ভদ্রমহিলা গোড়া থেকেই আমাকে তীব্র সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তবে আচার-আচরণে কখনো তা প্রকাশ হতে দেননি। বরং বাড়াবাড়ি রকম আন্তরিকতা দেখিয়েছেন।

হাত দেখার প্রতি এই মহিলার খুব দুর্বলতা আছে। আমি বেশ কয়েকবার তাঁর হাত দেখে দিয়েছি। হস্তরেখা-বিশারদ হিসেবে ভদ্রমহিলার কাছে আমার নাম আছে। তিনি অতি আন্তরিক ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে তুই তুই করেন। সেই আন্তরিকতার পুরোটাই মেকি। পাঁচ বছর পর এই মহিলাও অবিকল তাঁর স্বামীর মত আচরণ করবেন। স্বাভাবিক গলায় বলবেন, "কি রে হিমু, তোর খবর কি? দে, হাতটা দেখে দে।" তিনি এ জাতীয় আচরণ করবেন আবেগ চাপা দেবার জন্যে না, আবেগহীনতার জন্যে।

আর মারিয়া? মারিয়া কি করবে? কিছুই বলতে পারছি না। এই মেয়েটি

সম্পর্কে আমি কখনোই আগেভাগে কিছু বলতে পারিনি। তার আচার-আচরণে বোঝার কোন উপায় ছিল না — একদিন সে এসে আমার হাতে এক টুকরা কাগজ ধরিয়ে দেবে — যে কাগজে সাংকেতিক ভাষায় একটা প্রেমপত্র লেখা।

আমি সেদিন আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে একটা কঠিন বিষয় নিয়ে গল্প করছিলাম। বিষয়বস্তু এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স। আসাদুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন ইউনিভার্সে যতটুকু ভর থাকার কথা, ততটুকু নেই — বিজ্ঞানীরা হিসাব মিলাতে পারছেন না। নিউট্রিনোর যদি কোনো ভর থাকে তবেই হিসাব মেলে। এখন পর্যন্ত এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি যা থেকে বিজ্ঞানীরা নিউট্রিনোকে কিছু ভর দিতে পারেন। নিউট্রিনোর ভর নিয়ে আমাদের দু'জনের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। এমন দুশ্চিন্তাযুক্ত জটিল আলোচনার মাঝখানে মারিয়া এসে উপস্থিত। সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল — বাবা, আমি হিমু ভাইকে পাঁচ মিনিটের জন্য ধার নিতে পারি?

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, অবশ্যই।

মারিয়া বলল, পাঁচ মিনিট পরে আমি তাঁকে ছেড়ে দেব। তুমি যেখানে আলোচনা বন্ধ করেছিলে আবার সেখান থেকে শুরু করবে।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, আচ্ছা।

'তোমরা আজ কি নিয়ে আলাপ করছিলে?'

'নিউট্রিনোর ভর।'

'ও, সেই নিউট্রিনো? তার কোন গতি করতে পেরেছ?'

'না।'

'চেষ্টা করে যাও বাবা। চেষ্টায় কি না হয়!'

মারিয়া তার বাবার কাঁধে হাত রেখে সুন্দর করে হাসল। আসাদুল্লাহ সাহেব সেই হাসি ফেরত দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মাথায় তখনো নিউট্রিনো। আমি তাঁর হয়ে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

মারিয়া বলল, হিমু ভাই, আপনি আমার ঘরে আসুন।

আমি মারিয়ার ঘরে ঢুকলাম। এই প্রথম তার ঘরে ঢোকা। কিশোরী মেয়েদের ঘর যে রকম হয় সে রকম। র‍্যাক ভর্তি স্টাফড্ অ্যানিমেল। স্টেরিও সিস্টেম, এল পি রেকর্ড সারা ঘরময় ছড়ানো। ড্রেসিং টেবিলে এলোমেলো করে রাখা সাজবার জিনিস। বেশিরভাগ কৌটার মুখ খোলা। কয়েকটা ড্রেস মেঝেতে পড়ে আছে। খাটের পাশে রকিং চেয়ারে গাদা করা গল্পের বই। খাটের নিচে তিনটা চায়ের কাপ। এর মধ্যে একটা কাপে পিঁপড়া উঠেছে। নিশ্চয়ই কয়েকদিনের বাসি কাপ, সরানো হয়নি।

আমি বললাম, তোমার ঘর তো খুব গোছানো।

মারিয়া বলল, আমি আমার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেই না। মা'কেও না,

বাবাকেও না। আপনাকে প্রথম ঢুকতে দিলাম। আমার ঘর আমি নিজেই ঠিকঠাক করি। ক'দিন ধরে মন-টন খারাপ বলে ঘর গোছাতে ইচ্ছা করছে না।

'মন খারাপ কেন?'

'আছে, কারণ আছে। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

আমি বসলাম। মারিয়া বলল, আমি সাংকেতিক ভাষায় একটা চিঠি লিখেছি।

'কাকে?'

'আপনাকে। আপনি এই চিঠি পড়বেন। এখানে বসেই পড়বেন। সাংকেতিক চিঠি হলেও খুব সহজ সংকেতে লেখা। আমার ধারণা, আপনার বুদ্ধি বেশ ভাল। চিঠির অর্থ আপনি এখানে বসেই বের করতে পারবেন।'

'সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বুদ্ধি খুবই নিম্নমানের। ম্যাট্রিকে অংকে প্রায় ধরা খাচ্ছিলাম। সাংকেতিক চিঠি তো অংকেরই ব্যাপার। এখানেও মনে হয় ধরা খাব।'

মারিয়া তার রকিং চেয়ার আমার সামনে টেনে আনল। চেয়ারের উপর থেকে বই নামিয়ে বসে দোল খেতে লাগল। আমি সাংকেতিক চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। কিছু বুঝলাম না। তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে নিজের মনে দোল খাচ্ছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। সেখানে তার ছোটবেলার একখানা ছবি। আমি বললাম, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

মারিয়া বলল, বুঝতে না পারলে সঙ্গে করে নিয়ে যান। যেদিন বুঝতে পারবেন সেদিন উত্তর লিখে নিয়ে আসবেন।

'আর যদি কোনদিনই বুঝতে না পারি?'

'কোনদিন বুঝতে না পারলে আর এ বাড়িতে আসবেন না। এখন উঠুন, পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। আপনাকে বাবার কাছে দিয়ে আসি।'

আমি চিঠি হাতে উঠে দাঁড়ালাম।



মারিয়াদের বাড়ির নাম — চিত্রলেখা।

আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর পর চিত্রলেখার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

মানুষ তাদের বাড়ির নাম কেন রাখে? তাদের কাছে কি মনে হয় বাড়িগুলিও জীবন্ত? বাড়িদের প্রাণ আছে — তাদেরও অদৃশ্য হৃদপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করে?

কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করছি। কেউ এসে গেট খুলছে না। দারোয়ান তার খুপড়ি ঘর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েছে। আসছে না — কারণ উৎসাহ পাচ্ছে না। ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে কেউ এলে এরা উৎসাহ পায়। ছুটে এসে গেট খুলে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ায়। যারা দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে আসে তাদের বেলা ভিন্ন নিয়ম। ধীরে-সুস্থে এসে ধমকের গলায় বলবে — কাকে চান? দারোয়ানদের ধমক খেতে ইন্টারেস্টিং লাগে। এরা নানান ভঙ্গিতে ধমক দিতে পারে। কারো ধমকে থাকে শুধুই বিরক্তি, কারো ধমকে রাগ, কারো ধমকে আবার অবহেলা। একজনের ধমকে প্রবল ঘৃণাও পেয়েছিলাম। তার ঘৃণার কারণ স্পষ্ট হয়নি।

আমি আবারও বেল টিপে অপেক্ষা করত লাগলাম। আমার এমন কিছু তাড়া নেই। ঘন্টাখানিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তাড়া থাকে ভিখিরীদের। তাঁদের এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে হয়। সময় তাদের কাছে খুবই মূল্যবান। আমার কাছে সময় মূল্যহীন। 'চিত্রলেখা' নামের চমৎকার একতলা এই বাড়িটার সামনে একঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকাও যা, দু'ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকাও তা। সময় কাটানোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার। বাড়ির নাম নিয়ে ভাবা যেতে পারে। আচ্ছা, মানুষের নামে যেমন পুরুষ-রমণী ভেদাভেদ আছে — বাড়ির নামেও কি তাই আছে? কোন কোন বাড়ি হবে পুরুষবাড়ি। কোন কোন বাড়ি রমণীবাড়ি। চিত্রলেখা নিশ্চয়ই রমণীবাড়ি। সুগন্ধা, শ্রাবণী, শিউলীও মেয়েবাড়ি। পুরুষবাড়ির কোন নাম মনে পড়ছে না। এখন থেকে রাস্তায় হাঁটার সময় বাড়ির নাম পড়তে পড়তে যেতে হবে, যদি কোন পুরুষবাড়ির নাম চোখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা ভাল করে দেখতে হবে।

আমাকে প্রায় ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করতে হল — এর মধ্যে দারোয়ান শ্রেণীর একজন গেটের কাছে এসেছিল। গেট খুলতে বলায় সে বলল, যার কাছে চাবি সে

ভাত খাচ্ছে। ভাত খাওয়া হলে সে খুলে দেবে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনি কি চাবিটা এনে একটু খুলে দিতে পারেন না? এই কথায় সে বড়ই আহত হল। মনে হল তার সুদীর্ঘ জীবনে সে এমন অপমানসূচক কথা আর শোনেনি। কাজেই আমি বললাম, আচ্ছা থাক, আমি অপেক্ষা করি। আপনার কাছে ছাতা থাকলে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দিন। আমি ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকি, প্রচণ্ড রোদ।

সে এই রসিকতাতেও অপমানিত বোধ করল। বড় মানুষের বাড়ির কাজের মানুষদের মনে অপমানবোধ তীব্র হয়ে থাকে।

'আপনে কার কাছে আসছেন?'

'মারিয়ার কাছে।'

'আপা নাই।'

'না থাকলেও আসবে — আমি অপেক্ষা করব। গেট খুলে দিন।'

'গেট খুলনের নিয়ম নাই।'

আগের দারোয়ানদের কেউ নেই — সব নতুন লোকজন। আগেকার কেউ হলে চিনতে পারত। এত ঝামেলা হত না। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ভাইসাহেব, আপনার নাম?

'আমার নাম আবদুস সোবহান।'

'সোবহান সাহেব আপনি শুনুন — আমি খুব পাগলা কিসিমের লোক। গেট না খুললে গেটের উপর দিয়ে বেয়ে চলে আসব। আপনার সাহেবের কাছে গিয়ে বলুন — হিমু এসেছে।'

'ও অচ্ছা, আপনে হিমু? আপনের কথা বলা আছে।'

দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে গেট খুলতে লাগল।

আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিশাল ড্রয়িংরুম পার হয়ে খানিকটা খোলামেলা জায়গায় চলে এসেছি। কোন ফার্নিচার নেই। ঘরময় কার্পেট। এটা ফ্যামিলি রুম। ফ্যামিলির সদস্যরা এই ঘরে গল্প-গুজব করে, টিভি দেখে। যাদের ফ্যামিলি যত ছোট তাদের ফ্যামিলি রুমটা তত বিশাল। মারিয়াদের ড্রয়িংরুম আগের মতই ছিল, তবে ফ্যামিলি রুমের সাজসজ্জা বদলেছে। প্রকাণ্ড এক পিয়ানো দেখতে পাচ্ছি। পিয়ানো আগে ছিল না। পিয়ানো কে বাজায়? মারিয়া?

ফ্যামিলি রুমে কার্পেটের উপর হাসি খালাকে বসে থাকতে দেখলাম। তিনি তাঁর দু'হাত মেলে ধরেছেন। সেই হাতের নখে নেল পলিশ লাগাচ্ছেন সিরিয়াস চেহারার এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখে সোনালী চশমা, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। তিনি খুব একটা বাহারী পাঞ্জাবি পরে আছেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিখ্যাত ও ক্ষমতাবানদের কেউ হবেন। এ বাড়িতে বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান ছাড়া অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই। নেল পলিশ লাগানোর ব্যাপারে ভদ্রলোকের মনোযোগ দেখে মনে হচ্ছে কাজটা অত্যন্ত

জটিল। হাসি খালাও নড়াচড়া করছেন না। স্থির হয়ে আছেন। হাসি খালা এক ঝলক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু, তোর কি খবর?

'কোন খবর নেই।'

'মারিয়া বলেছিল তুই আসবি।'

যে ভদ্রলোক নেল পলিশ লাগাচ্ছেন তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, হাসি, নড়াচড়া করবে না। নড়লে আঙুল নড়ে যায়।

আমি বললাম, খালা, হচ্ছে কি?

হাসি খালা বললেন, কি হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। নতুন কায়দায় নেল পলিশ লাগানো হচ্ছে। নখের গোড়ায় কড়া লাল রঙ। আস্তে আস্তে নখের মাথায় এসে রঙ মিলিয়ে যাবে।

'জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'জটিল তো বটেই। জিনিসটা দাঁড়ায় কেমন সেটা হচ্ছে কথা। এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট।'

ভদ্রলোক আরেকবার বিরক্ত গলায় বললেন — হাসি, প্লীজ।

আমি কিছুক্ষণ নেল পলিশ দেয়া দেখলাম। গাঢ় লাল, হালকা লাল, সাদা — তিন রঙের কৌটা, নেল পলিশ রিমুভার নিয়ে প্রায় স্থুলস্থুল ব্যাপার হচ্ছে।

হাসি খালা বললেন, জামিল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। এ হচ্ছে হিমু। ভাল নাম এভারেস্ট, কিংবা হিমালয়। মারিয়ার বাবার অনেক আবিষ্কারের এক আবিষ্কার। খুব ভাল হাত দেখতে পারে। হাত দেখে যা বলে তাই হয়।

ভদ্রলোক চোখ-মুখ কুঁচকে ফেললেন। আমি সামনে থেকে সরলে তিনি বাঁচেন এই অবস্থা। আমি বিনয়ী গলায় বললাম, স্যার, ভাল আছেন?'

ভদ্রলোক বললেন, ইয়েস, আই অ্যাম ফাইন। থ্যাংক য়্যু।

'আপনার নেল পলিশ দেয়া খুব চমৎকার হচ্ছে, স্যার।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল। হাসি খালা বললেন — তুই যা, মারিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করে আয়। আর শোন, চলে যাবার আগে আমার হাত দেখে দিবি। জামিল, তুমি কি হিমুকে দিয়ে হাত দেখাবে?

জামিল নামের ভদ্রলোক নেল পলিশের রঙ মেশানোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শীতল গলায় বললেন — এইসব আধিভৌতিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই।

আমি বললাম, আধিভৌতিক বলে সবকিছু উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না, স্যার। অ্যাস্ট্রলজি ছিল আধিভৌতিক ব্যাপার। সেই অ্যাস্ট্রলজি থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক অ্যাস্ট্রনমি। এক সময় আলকেমিও ছিল আধিভৌতিক। সেই আলকেমি থেকে আমরা পেয়েছি আধুনিক রসায়নবিদ্যা।

জামিল সাহেব বললেন, মিস্টার এভারেস্ট, এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে

তর্ক করতে চাচ্ছি না। আমি একটা কাজ করছি। যদি কখনো সুযোগ হয় পরে কথা হবে।

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

এই ঘর আগের মতই আছে। একটুও বদলায়নি। খাটে শুয়ে থাকা মানুষটা শুধু বদলেছে। ভরাট স্বাস্থ্যের সেই মানুষ নেই। রোগাভোগা একজন মানুষ। মাথাভর্তি চুল ছিল, চুল কমে গেছে। চোখের তীব্র জ্যোতিও ম্লান। নিজের তৈরি বেহেশতে জীবনযাপন করতে করতে তিনি সম্ভবত ক্লান্ত।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, কেমন আছ হিমু?

'ভাল।'

'তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছে।'

'আপনাকে দেখে আমার তেমন ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'

'স্বর্গে বাস করা ক্লান্তিকর ব্যাপার হিমু। আমি আসলেই ক্লান্ত। সময় কাটছে না।'

'সময় কাটছে না কেন?'

'কিভাবে সময় কাটাব সেটা বুঝতে পারছি না। এখন বই পড়তে পারি না।'

'বই পড়তে পারেন না?'

'না। বই পড়তে ভাল লাগে না, গান শুনতে ভাল লাগে না, শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। যা ভাল লাগে না, তা করি না। বই পড়ি না, গান শুনি না। কিন্তু শুয়ে থাকতে ভাল না লাগলেও শুয়ে থাকতে হচ্ছে। আই হ্যাভ নো চয়েস। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন হিমু, বোস। আমার বিছানায় বোস।'

আমি বসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব মুখ টিপে খানিকক্ষণ মিট মিট করে হাসলেন। কেন হাসলেন ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎ মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন — এখন আমি কি করছি জান?

'জ্বি না, জানি না। আপনি বলুন, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি।'

'আমি যা করছি তা হচ্ছে মানসিক গবেষণা।'

'সেটা কি?'

'মনে মনে গবেষণা। কোন একটা বিষয় নিয়ে জটিল সব চিন্তা করছি কিন্তু সবই মনে মনে। আমার সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয় হল — নারী-পুরুষ সম্পর্ক।

'প্রেম?'

'হ্যাঁ প্রেম। হিমু, তুমি কখনো কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছ?'

'না।'

'মেয়েরা তোমার প্রেমে পড়েছে?'

'না।'

'তুমি নিশ্চিন্ত?'

'হ্যাঁ নিশ্চিন্ত।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, প্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি বল তো?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি তো এইসব নিয়ে গবেষণা করছি না। কাজেই বলতে পারছি না। আপনি বরং বলুন গবেষণা করে কি পেয়েছেন।

'শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বুকের নিচে বালিশ দিয়ে একটু উঁচু হলেন। কথা বলা শুরু করলেন শান্ত ভঙ্গিতে এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে।

'হিমু শোন, গবেষণা না — একজন শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা। চিন্তাও ঠিক না — ফ্যান্টাসি। আমার মনে হয় কি জান? সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পাঁচটি অদৃশ্য নীলপদ্ম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। এই নীলপদ্মগুলি হল — প্রেম-ভালবাসা। যেমন ধর তুমি। তোমাকে পাঁচটি নীলপদ্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত তুমি কাউকে পাওনি যাকে পদ্ম দিতে ইচ্ছে করেছে। কাজেই তুমি কারোর প্রেমে পড়নি। আবার ধর, একটা সতেরো বছরের তরুণীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল। মেয়েটির তোমাকে এতই ভাল লাগলো যে, সে কোনদিকে না তাকিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে তার সবক'টি নীলপদ্ম তোমাকে দিয়ে দিল। তুমি পদ্মগুলি নিলে কিন্তু তাকে গ্রহণ করলে না। পরে এই মেয়েটি কিন্তু আর কারো প্রেমে পড়তে পারবে না। সে হয়ত এক সময় বিয়ে করবে, তার স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার করবে কিন্তু স্বামীর প্রতি প্রেম তার থাকবে না।'

আমি বললাম, আর আমার কি হবে? আমার নিজের পাঁচটি নীলপদ্ম ছিল, তার সঙ্গে আরো পাঁচটি যুক্ত হয়ে পদ্মের সংখ্যা বেড়ে গেল না?'

'হ্যাঁ, বাড়ল।'

'তাহলে আমি কি ইচ্ছা করলে এখন কাউকে পাঁচটির জায়গায় দশটি পদ্ম দিতে পারি?

'তা পার না। অন্যের পদ্ম দেয়া যাবে না। তোমাকে যে পাঁচটি দেয়া হয়েছে শুধু সেই পাঁচটি দেয়া যাবে।'

'পাঁচটি কেন বলেছেন? পাঁচের চেয়ে বেশি নয় কেন?'

পাঁচ হচ্ছে একটা ম্যাজিক সংখ্যা। এই জন্যেই বলছি পাঁচ। আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটি। বেশিরভাগ ফুলের পাপড়ি থাকে পাঁচটি। পাঁচ হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা তবে পাঁচের ব্যাপারটা আমার কল্পনা, পাঁচের জায়গায় সাতও হতে পারে। আমার হাইপোথেসিস তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

'চমৎকার লাগছে।'

'আজকাল আমি দিন-রাত এটা নিয়েই ভাবি। আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ নীলপদ্ম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, দেয়ার মানুষ পায় না।'

'অনেকে হয়ত দিতেও চায় না।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অনেকে পদ্মগুলি হাতছাড়া করতে চায় না। আবার এমনও হতে পারে, পদ্মগুলি দেয়া হয় ভুল মানুষকে। যাকে দেয়া হল সে পদ্মের মূল্যই বুঝল না। এই হচ্ছে আমার নীলপদ্ম থিওরি। তোমাকে বললাম, তুমি তো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াও, অনেকের সঙ্গে মেশ, আমার থিওরিটা পরীক্ষা করে দেখ।'

'জ্বি আচ্ছা। তবে আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, কিছু কিছু রহস্যময় ব্যাপার সম্পর্কে কোন থিওরি না দেয়াই ভাল। থিওরি বা হাইপোথেসিস রহস্য নষ্ট করে। থাকুক না কিছু রহস্য। সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডুবে, সকালে ওঠে। কত রহস্যময় একটা ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে এটা হচ্ছে জানার পর আর রহস্য থাকে না।'

'হিমু, তুমি কি জ্ঞানের বিপক্ষে?'

'জ্বি। জ্ঞান এক ধরনের বাধা। এক ধরনের অন্ধকার। কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের দূরত্ব তৈরি করিয়ে দেয়।'

'বুঝতে পারছি না।'

'যেমন ধরুন, আপনার নীলপদ্ম থিওরি। এটা জানার পর থেকে আমার কি হবে জানেন? কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি ভাবব, আচ্ছা, এই মেয়েটিকে কি নীলপদ্ম দেয়া যায়? দেয়া গেলে ক'টা দেয়া যায়? মেয়েটি তার নিজের নীলপদ্মগুলি কি করেছে? কাউকে দিয়ে ফেলেছে?'

'আমার হাইপোথেসিস তুমি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? তোমাকে তো আগেই বলেছি এইসব আর কিছুই না, একজন অসুস্থ শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত প্রলাপ।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আমি আসি।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, তোমার কি মারিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

'জ্বি না।'

'মারিয়া বাসাতেই আছে। নিজের ঘরে বসে আছে। ও কারো সঙ্গেই দেখা করে না। কথা বলে না। এমনকি আমার সঙ্গেও না।'

'তাই না-কি?'

'তুমি যাবার আগে অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করে যাবে।'

'কারো সঙ্গেই যখন দেখা করে না — আমার সঙ্গেও করবে না।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হাসলেন। পুরানো দিনের সেই চমৎকার হাসি। আমি চমকে উঠলাম।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'আমি আমার নীলপদ্ম থিওরি মারিয়াকে দেখে দেখেই তৈরি করেছি। মারিয়া তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি তোমাকে লেখে। খুব অল্প বয়সে লেখে। কাজেই আমার থিওরি অনুযায়ী তার সবক'টা নীলপদ্ম তোমার কাছে।'

'চিঠি লেখার ব্যাপারটি আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। আমার মেয়ের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল, সে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি আমাকে দেখিয়ে লিখবে। মারিয়া চুক্তি রক্ষা করেছে। আমাকে চিঠিটি দেখিয়েছে, তবে আমি যেন বুঝতে না পারি সে জন্যে ছেলেমানুষী এক সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে।'

'আপনি সেই সাংকেতিক চিঠির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছেন?'

'অবশ্যই। তবে ভান করেছি বুঝতে পারেনি।'

'মারিয়া সেই চিঠি কাকে লিখেছিল তা-কি আপনাকে বলেছে?'

'না। তবে আমি অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি খারাপ না। হিমু শোন, আমার মেয়েটা পড়াশোনার জন্যে ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছে। আমি নিজেই জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মনের যে শক্তি মানুষকে চালিত করে আমার মেয়েটার মনের সেই শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে সেই শক্তি ফেরত দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজটা আমি তোমাকে দিয়ে করাতে চাই। এই জন্যেই তোমাকে এত ব্যস্ত হয়ে খুঁজছি।'

'মনের শক্তি জাগানোর কাজটা আপনি করতে পারছেন না কেন?'

'আমার উপর মেয়েটির যে বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন?'

আসাদুল্লাহ সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন — তুমি কি লক্ষ্য করেছ মারিয়ার মা'র নখে এক ভদ্রলোক নেল পলিশ লাগাচ্ছেন?

'হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি।'

'নেল পলিশের এই এক্সপেরিমেন্ট অনেকদিন ধরেই করা হচ্ছে। মারিয়ার মা ঐ ভদ্রলোকের প্রেমে পড়েছে। তারা শিগগিরই বিয়ে করবে। আমি সব জেনেও কিছু বলছি না। মারিয়া এতেও আহত হয়েছে। জীবনে সে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে।'

'আমাকে কি করতে বলেন?'

'ওকে জীবনের জটিলতার অংশটার কথা বুঝিয়ে বল। ও তোমার কথা শুনবে কারণ ওর নীলপদ্মগুলি তোমার কাছে।'



মারিয়া বলল, বসুন।

তার চোখ-মুখ কঠিন, তবু মনে হল সেই কাঠিন্যের আড়ালে চাপা হাসি ঝিকমিক করছে। সে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চাঁপা রঙের শাড়ি। রঙটা এমন যে মনে হচ্ছে ঘরে চাঁপাফুলের গন্ধ পাচ্ছি। গলায় লাল পাথর। চুণী নিশ্চয় না। চুণী এত বড় হয় না।

'রকিং চেয়ারে আরাম করে বসে দোল খেতে খেতে কথা বলুন। বাবা আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাই তো?'

আমি দোল খেতে খেতে বললাম, হ্যাঁ।

'বাবার ধারণা, আমার মন খুব অশান্ত। সেই অশান্ত মন শান্ত করার সোনার কাঠি আপনার কাছে। তাই না?'

'এ রকম ধারণা ওনার আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'এ রকম অদ্ভুত ধারণার কারণ জানেন?'

'না।'

'কারণটা আপনাকে বলি — অ্যাকসিডেন্টের পর বাবা মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আপনি তাঁকে কিছু কথা বলেন। তাতে তাঁর মন শান্ত হয়। সেই থেকেই বাবার ধারণা হয়েছে মন শান্ত করার মত কথা আপনি বলতে পারেন। ভাল কথা, বাবাকে আপনি কি বলেছিলেন?'

'আমার মনে নেই। উদ্ভট কথাবার্তা তো আমি সব সময়ই বলি। তাঁকেও মনে হয় উদ্ভট কিছুই বলেছিলাম।'

'আমাকেও তাহলে উদ্ভট কিছু বলবেন?'

'তোমাকে উদ্ভট কিছু বলব না। তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলে আমি তার জবাব লিখে এনেছি। সাংকেতিক ভাষায় লিখে এনেছি।'

মারিয়া হাত বাড়াল। তার চোখে চাপা কৌতুক ঝকমক করছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে সে খিলখিল করে হেসে ফেলবে। যেন সে অনেক কষ্টে হাসি থামাচ্ছে।

'সাংকেতিক চিঠিটায় কি লেখা পড়তে পারছ?'

'পারছি। এখানে লেখা I hate you.'

'I love you-ও তো হতে পারে।'

'সংকেতের ব্যাখ্যা সবাই তার নিজের মত করে করে, আমিও তাই করলাম। আপনার আটটা তারার অনেক মানে করা যায়, যেমন —

I want you.

I miss you.

I lost you.

আমি আমার পছন্দমত একটা বেছে নিলাম।'

'মারিয়া, তোমার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়?'

'যায় না, কিন্তু আপনি খেতে পারেন।'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, তুমি কি তোমার বাবার নীলপদ্ম থিওরির কথা জান?

মারিয়া এইবার হেসে ফেলল। কিশোরীর সহজ স্বচ্ছ হাসি। হাসতে হাসতে বলল, আজগুবি থিওরি। আজগুবি এবং হাস্যকর।

'হাস্যকর বলছ কেন?'

'হাস্যকর এই জন্যে বলছি যে, বাবার থিওরি অনুসারে আমার পাঁচটি নীলপদ্ম এখন আপনার কাছে। কিন্তু আমি আপনার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করছি না। আপনাকে দেখে কোন রকম আবেগ, রোমাঞ্চ কিছুই হচ্ছে না। বরং কিশোরী বয়সে যে পাগলামিটা করেছিলাম তার জন্যে রাগ লাগছে। বাবার থিওরি ঠিক থাকলে কিশোরী বয়সে পাগলামির জন্যে এখন রাগ লাগত না।'

'এখন পাগলামি মনে হচ্ছে?'

'অবশ্যই মনে হচ্ছে। হিমু ভাই, আমি সেই সময় কি সব পাগলামি করেছি একটু শুনুন। চা খাবেন?'

'না।'

'খান একটু। আমি খাচ্ছি, আমার সঙ্গে খান। বসে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

মারিয়া বের হয়ে গেল। আমি নিজের মনে দোল খেতে লাগলাম। দীর্ঘ পাঁচ বছরে মারিয়ার ঘরের কি কি পরিবর্তন হয়েছে তা ধরার চেষ্টাও করছি। ধরতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে ঘরটা ঠিক আগের মত আছে, আবার মনে হচ্ছে একেবারেই আগের মত নেই। সবই বদলে গেছে। মারিয়ার ছোটবেলাকার ছবিটা শুধু আছে। ছবি বদলায় না।

মারিয়া ট্রেতে করে মগভর্তি দু'মগ চা নিয়ে ঢুকল। কোন কারণে সে বোধহয় খুব হেসেছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে।'

'হিমু ভাই, চা নিন।'

আমি চা নিলাম। মারিয়া হাসতে হাসতে বলল, জামিল চাচার সঙ্গে কি

আপনার দেখা হয়েছে?

'নখ-শিল্পী?'

'হ্যাঁ নখ-শিল্পী। মা'র নখের শিল্পকর্ম তিনি কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছেন। মা সেই শিল্পকর্ম দেখে বিস্ময়ে অভিভূত।'

'খুব সুন্দর হয়েছে?'

'দেখে মনে হচ্ছে নখে ঘা হয়েছে — রক্ত পড়ছে। মা'কে এই কথা বলায় মা খুব রাগ করল। মা'র রাগ দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। মা যত রাগ করে আমি তত হাসি। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে। চায়ে চিনি-টিনি সব ঠিক হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'বাবার সঙ্গে মা'র কিভাবে বিয়ে হয়েছিল সেটা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না। ঐ গল্প থাক — তোমার গল্পটা বল। কিশোরী বয়সে কি পাগলামি করলে?'

'আমার গল্পটা বলছি কিন্তু মা'র গল্পটা না শুনলে আমারটা বুঝতে পারবেন না। মা হচ্ছেন বাবার খালাতো বোন। মা যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন তখন বাবার জন্যে মা'র মাথা-খারাপের মত হয়ে গেল। বলা চলে পুরো উন্মাদিনী অবস্থা। বাবা সেই অবস্থাকে তেমন পাত্তা দিলেন না। মা কিছু ডেসপারেট মুভ নিলেন। তাতেও লাভ হল না। শেষে একদিন বাবাকে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখে সিনেমার প্রেমিকাদের মত একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়ে ফেললেন। মা'র জীবন সংশয় হল। এখন মরে তখন মরে অবস্থা। বাবা হাসপাতালে মা'কে দেখতে গেলেন। মা'র অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হল। বাবা হাসপাতালেই ঘোষণা করলেন — মেয়েটা যদি বাঁচে তাকে বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই। মা বেঁচে গেলেন। তাঁদের বিয়ে হল। গল্পটা কেমন?'

'ইন্টারেস্টিং।'

'ইন্টারেস্টিং না, সিনেমাটিক। ক্লাসিক্যাল লাভ স্টোরি। প্রেমিককে না পেয়ে আত্মহননের চেষ্টা। এখন হিমু ভাই, আসুন, মা'র ক্ষেত্রে বাবার নীলপদ্ম থিওরি অ্যাপ্লাই করি। থিওরি অনুযায়ী মা তাঁর নীলপদ্মগুলি বাবাকে দিয়েছিলেন — সব ক'টা দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে পড়ন্ত যৌবনে মা জামিল চাচাকে দেয়ার জন্যে নীলপদ্ম পেলেন কোথায়? জামিল চাচা বিবাহিত একজন মানুষ। তাঁর বড় মেয়ে মেডিকেলে পড়ছে। তিনি যখন-তখন এ বাড়িতে আসেন। মা'র শোবার ঘরে দু'জনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেন। শোবার ঘরের দরজাটা তাঁরা পুরোপুরি বন্ধও করেন না, আবার খোলাও রাখেন না। সামান্য ফাঁক করে রাখেন। মজার ব্যাপার না?'

আমি কিছুই বললাম না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে মারিয়ার হাসি হাসি মুখের

দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'বাবার নীলপদ্ম বিষয়ক হাস্যকর ছেলেমানুষী থিওরির কথা আমাকে বলবেন না।'

'আচ্ছা বলব না।'

'প্রেম নিতান্তই জৈবিক একটা ব্যাপার — নীলপদ্ম বলে একে মহিমান্বিত করার কিছু নেই।'

'তাও স্বীকার করছি।'

'হিমু ভাই, আপনি এখন বিদেয় হোন — আপনার চা আশা করি শেষ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, চা শেষ।'

'আমাকে নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই। বাবার কাছে শুনেছেন নিশ্চয়ই, আমি বাইরে পড়তে চলে যাচ্ছি। এখানকার কোন কিছু নিয়েই আর আমার মাথাব্যথা নেই। বাবার সময় কাটছে না, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমি দেখব আমার নিজের জীবন, আমার কেরিয়ার।'

'খুবই ভাল কথা।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মারিয়া বলল, ও আচ্ছা, আরো কয়েক মিনিট বসুন, আপনাকে নিয়ে কি সব পাগলামি করেছি তা বলে নেই। আপনার শোনার শখ ছিল।

আমি বসলাম। মারিয়া আমার দিকে একটু ঝুঁকে এল। দামী কোন পারফিউম সে গায়ে দিয়েছে। পারফিউমের হালকা সুবাস পাচ্ছি। হালকা হলেও সৌরভ নিজেকে জানান দিচ্ছে কঠিনভাবেই। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। মারিয়ার চুল খোলা। এই খোলা চুল ফ্যানের বাতাসে উড়ছে। কিছু এসে পড়ছে আমার মুখে। ভয়াবহ সুন্দর একটি দৃশ্য।

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'একটা সময়ে আমি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। ভয়ংকর কষ্টের কিছু সময় পার করেছি। রাতে ঘুম হত না। রাতের পর রাত জেগে থাকার জন্যেই হয়ত মাথাটা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপার হত। অনেকটা হেলুসিনেশনের মত। মনে করুন পড়তে বসেছি, হঠাৎ মনে হল আপনি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার বই-এ আপনার ছায়া পড়েছে। তখন বুক ধুক ধুক করতে থাকত। চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখতাম — কেউ নেই। আপনাকে তখনই চিঠিটা লিখি। আপনি তার জবাব দেননি। আমাদের বাড়িতে আর আসেনওনি।'

'না এসে ভালই করেছি। তোমার সাময়িক আবেগ যথাসময়ে কেটে গেছে। তুমি ভুল ধরতে পেরেছ।'

'হ্যাঁ, তা পেরেছি। ঐ সময়টা ভয়ংকর কষ্টে কষ্টে গেছে। রোজ ভাবতাম, আজ আপনি আসবেন। আপনি আসেননি। আপনার কোন ঠিকানা নেই আমাদের কাছে যে আপনাকে খুঁজে বের করব। আমার সে বছর এ লেভেল পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। আমার পরীক্ষা দেয়া হয়নি। প্রথমত, বই নিয়ে বসতে পারতাম না। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হত আমি পরীক্ষা দিতে যাব আর আপনি এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যাবেন। আমি রোজ রাতে দরজা বন্ধ করে কাঁদতাম।'

বলতে বলতে মারিয়া হাসল। কিন্তু তার চোখে অনেকদিন আগের কান্নার ছায়া পড়ল। এই ছায়া সে হাসি দিয়ে ঢাকতে পারল না।

আমি বললাম, তারপরেও তুমি বলছ নীলপদ্ম কিছু না — পুরো ব্যাপারটাই জৈবিক?

'হ্যাঁ বলছি। তখন বয়স অল্প ছিল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি। চারপাশে কি ঘটছে তা দেখে শিখছি।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে খুবই দুঃখিত।

'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চিঠি নিয়ে যান। আট তারার চিঠি। এই হাস্যকর চিঠির আমার দরকার নেই।'

আমি চিঠি নিয়ে পকেটে রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আসাদুল্লাহ সাহেবের নীলপদ্ম থিওরি ঠিক আছে। এই তরুণী তার সমস্ত নীলপদ্ম হিমু নামের এক ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তীব্র কষ্ট ও যন্ত্রণার ভেতর বাস করছে। এই যন্ত্রণা, এই কষ্ট থেকে তার মুক্তি নেই। আমি তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে এখন মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অশ্রু গোপন করার জন্যে মেয়েরা ঐ ভঙ্গিটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে।

'মারিয়া!'

'জ্বি।'

'ভাল থেকো।'

'আমি ভালই থাকব।'

'যাচ্ছি, কেমন?'

'আচ্ছা যান। আমি যদি বলি — আপনি যেতে পারবেন না, আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে — আপনি কি থাকবেন? থাকবেন না। কাজেই যেতে চাচ্ছেন, যান।'

'গেট পর্যন্ত এগিয়ে দাও!'

'না। ও আচ্ছা, আমার হাতটা দেখে দিয়ে যান। আমার ভবিষ্যৎটা কেমন হবে বলে দিয়ে যান।'

মারিয়া তার হাত এগিয়ে দিল। মারিয়ার হাত দেখার জন্যে আমি আবার বসলাম।

'খুব ভাল করে দেখবেন। বানিয়ে বানিয়ে বলবেন না।'

'তোমার খুব সুখের সংসার হবে। স্বামী-স্ত্রী এবং একটি কন্যার অপূর্ব সংসার। কন্যাটির নাম তুমি রাখবে — চিত্রলেখা।'

মারিয়া খিল খিল করে হাসতে হাসতে হাত টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল — থাক, আপনাকে আর হাত দেখতে হবে না। বানিয়ে বানিয়ে উদ্ভট কথা! আমি আমার মেয়ের নাম চিত্রলেখা রাখতে যাব কেন? দেশে নামের আকাল পড়েছে যে বাড়ির নামে মেয়ের নাম রাখব? যাই হোক, আমি অবশ্যি ভবিষ্যত জানার জন্য আপনাকে হাত দেখতে দেইনি। আমি আপনার হাত কিছুক্ষণের জন্য ধরতে চাচ্ছিলাম। এম্নিতে তো আপনি আমার হাত ধরবেন না। কাজেই অজুহাত তৈরি করলাম। হিমু ভাই, আপনি এখন যান। প্রচণ্ড রোদ উঠেছে, রোদে আপনার বিখ্যাত হাঁটা শুরু করুন।

মারিয়ার গলা ধরে এসেছে। সে আবার মাথা নিচু করে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার ভেতর এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হল। মনে হল আমার আর হাঁটার প্রয়োজন নেই। মহাপুরুষ না, সাধারণ মানুষ হয়ে মমতাময়ী এই তরুণীটির পাশে এসে বসি। যে নীলপদ্ম হাতে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম, সেই পদ্মগুলি তার হাতে তুলে দেই। তারপরই মনে হল — এ আমি কি করতে যাচ্ছি! আমি হিমু — হিমালয়।

মারিয়া বলেছিল সে গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসবে না। কিন্তু সে এসেছে। গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর মনে হচ্ছিল মারিয়া চাঁপা রঙের শাড়ি পরে আছে, এখন দেখি শাড়ির রঙ নীল। রোদের আলোয় রঙ বদলে গেল, নাকি প্রকৃতি আমার ভেতর বিভ্রম তৈরি করা শুরু করেছে?

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'যাবার আগে আপনি কি বলে যাবেন আপনি কে?'

আমি বললাম, মারিয়া, আমি কেউ না। I am nobody।

আমি আমার এক জীবনে অনেককে এই কথা বলেছি — কখনো আমার গলা ধরে যায়নি, বা চোখ ভিজে ওঠেনি। দু'টা ব্যাপারই এই প্রথম ঘটল।

মারিয়া হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রচণ্ড রোদে আমি হাঁটছি। ঘামে গা ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। বড় রাস্তায় এসে জামের ভেতর পড়লাম, কার যেন বিজয় মিছিল বের হয়েছে। জাতীয় পার্টির মিছিল। ব্যানারে এরশাদ সাহেবের ছবি আছে। আন্দোলনের শেষে সবাই বিজয়

মিছিল করছে, তারাই বা করবে না কেন? এই প্রচণ্ড রোদেও তাদের বিজয়ের আনন্দে ভাটা পড়ছে না। দলের সঙ্গে ভিড়ে যাব কি–না ভাবছি। একা হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। মিছিলের সঙ্গে থাকায় একটা সুবিধা হচ্ছে। অনেকের সঙ্গে থেকেও একা থাকা যায়।

কিছুক্ষণ হাঁটলাম মিছিলের সঙ্গে। একজন আমার হাতে এরশাদ সাহেবের একটা ছবি ধরিয়ে দিল। এরশাদ সাহেবের আনন্দময় মুখের ছবি। প্রচণ্ড রোদে সেই হাসি ম্লান হচ্ছে না।

মিছিল কাওরান বাজার পার হল। আমরা গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছি — পল্লীবন্ধু এরশাদ।

জিন্দাবাদ!

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আমার পা–খোঁড়া কুকুরটা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। কাওরান বাজার তার এলাকা। সে আমাকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে আমার পাশে পাশে চলা শুরু করেছে। তার খোঁড়া পা মনে হচ্ছে পুরোপুরি অচল — এখন আর মাটিতে ফেলতে পারছে না। তিন পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আমি বললাম, তিন পায়ে হাঁটতে তোর কষ্ট হচ্ছে না তো?

সে বলল, কুঁই কুঁই কুঁই।

কি বলতে চেষ্টা করল কে জানে? কুকুরের ভাষা জানা থাকলে সুবিধা হত। আমার জানা নেই, তারপরেও আমি তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগুচ্ছি —

'তুই যে আমার সঙ্গে আসছিস আমার খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে খুব একা লাগে, বুঝলি? আমার সঙ্গে কি আছে জানিস? পদ্ম। নীলপদ্ম। পাঁচটা নীলপদ্ম নিয়ে ঘুরছি। কি অপূর্ব পদ্ম! কাউকে দিতে পারছি না। দেয়া সম্ভব নয়। হিমুরা কাউকে নীলপদ্ম দিতে পারে না।

চৈত্রের রোদ বাড়ছে। রোদটাকে আমি জোছনা বানানোর চেষ্টা করছি। বানানো খুব সহজ — শুধু ভাবতে হবে — আজ গৃহত্যাগী জোছনা উঠেছে — চারদিকে থৈ-থৈ করছে জোছনা। ভাবতে ভাবতেই এক সময় রোদটাকে জোছনার মত মনে হতে থাকবে। আজ অনেক চেষ্টা করেও তা পারছি না। ক্লান্তিহীন হাঁটা হেঁটেই যাচ্ছি — হেঁটেই যাচ্ছি।
